জয় বাংলা ! জয় মুজিব !

সপ্তবহ্নি

বাংলা একাডেমী : ঢাকা
বাংলা একাডেমী : ঢাকা

পুনর্মুদ্রণ—
১৯৭২

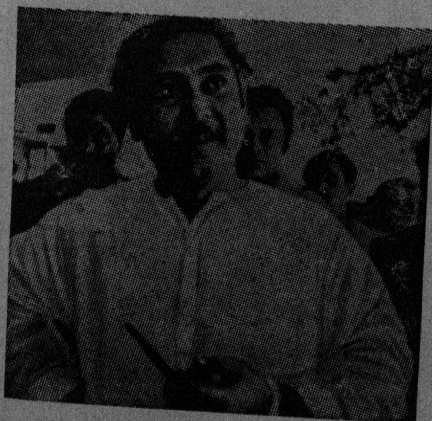
বাএ ৯৮৭
পাণ্ডুলিপি ঃ অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে
উৎসর্গীকৃত-প্রাণ অমর
শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—



জয় বাংলা, ও আমার সোনার বাংলা



আমি বাংলা মায়ের ছেলে



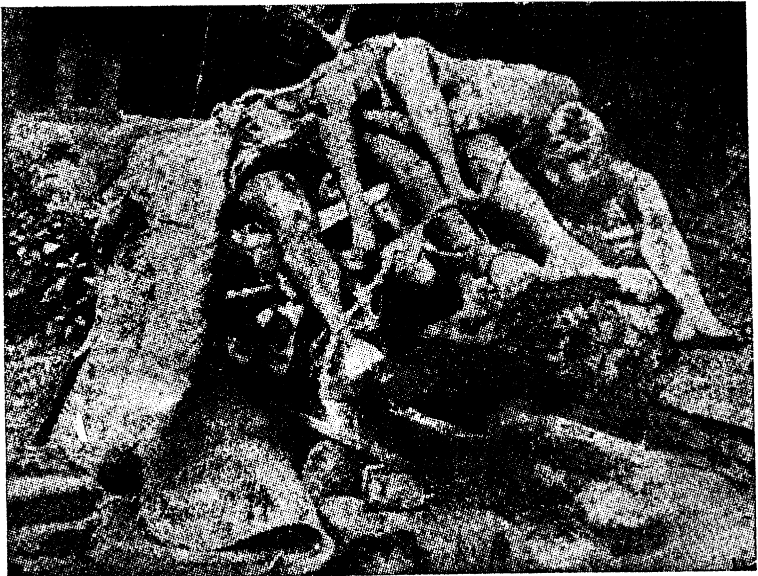
জয় আমাদের চাই ই-ই-ই



বাংলার স্বাধীনতার জন্য রক্ত যত লাগে লাগুক



আমাদের কথা জনগণের কথা





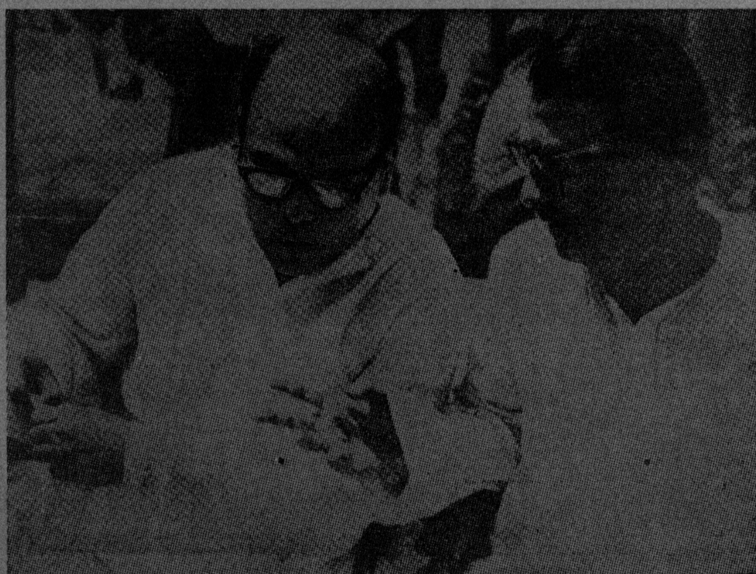
বীরের এ রক্ত স্রোত···ধরার ধূলিতে হবে কি হারা ?



বাংলার মাটি ভিজে গেল রক্তধারায়



ইয়াহিয়া, নারীর শক্তির কাছে তোমায় পরাজয় মানতেই হবে



কোন কথা চাই না, স্বাধীন বাংলা চাই

উত্তাল হয়ে উঠেছে জনসমুদ্র।

হাজার হাজার নয়—লক্ষ লক্ষ মানুষ।

মাথাব উপরে সগর্বে পত্ পত্ করে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

ঘন সবুজ জমির ওপরে রক্তরাঙা গোল চিহ্ন। তার ঠিক মাঝখানে সোনালী রেখায় আঁকা পূর্ববাংলার মানচিত্র।

মাঝে মাঝে লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠছে—জয় বাংলা—জয় বাংলা! জয় মুজিবর রহমান!

জনগণের এই উদ্বেল জাগরণ বিনা কারণে হয়নি। সারা পাকিস্তানে জনগণেব নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা অর্পণ কবতে প্রতিশ্রুত হয়ে নির্বাচন আহ্বান করেছিলেন ইয়াহিয়া খান। সে নির্বাচনে সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ ভোট ও পূর্ববাংলার শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলার বাঘ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

কিন্তু জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া খান তাঁর কথা ঠিক রাখতে পারেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানের পিপ্‌লস্ পার্টির নেতা কুচক্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর পরামর্শে তিনি মুজিবরকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতে, তাঁর হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিতে অস্বীকার করেন।

কিছুদিন আগেও তিনি নিজে পূর্ববাংলায় এসে শেখ মুজিবরকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি বেঁকে বসলেন।

তার কারণও অবশ্য ছিল।

পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্না থেকে শুরু করে আয়ুব খাঁ ও ইয়াহিয়া খাঁ সকলেই আজীবন পূর্ববাংলাকে শোষণ করেই পশ্চিম পাকিস্তানকে ধনী করেছেন। ভারত-বিদ্বেষের জিগীর তুলে পূর্ববাংলার লোকদের বিভ্রান্ত করেছেন। পূর্ববাংলার পাট, চা, নানা কাঁচা দ্রব্য বিশ্বের বাজারে বিক্রি করে তাঁরা সেই টাকায় পশ্চিম পাকিস্থানকে পোষণ করেছেন। অথচ পূর্ববাংলার দিকে কেউ ফিরেও তাকাননি।

সমস্ত পাকিস্তানের (পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে) যা লোকসংখ্যা তার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ববাংলার লোক, আর মাত্র ৪৪ ভাগ পশ্চিমের চারটি প্রদেশের লোক। তাদের মধ্যে আছে নানা দল—নানা উপভাগ।

কিন্তু পাকিস্তানে উপার্জিত টাকার অধিকাংশ পশিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাব আর সিন্ধুর উত্তরাংশের জন্য খরচ করা হয়। পূর্ববাংলার মানুষ তবু স্বর্ণপ্রসূ হংসের মত টাকা জোগায়—অথচ তারা হয় শাসিত ও শোষিত।

তাই আজ পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এসে মিলেছে আওয়ামী লীগ-নেতা শেখ মুজিবর রহমানের পতাকাতলে। তাদের দাবী মানতেই হবে।

প্রথমেই চলল ইয়াহিয়া খানের জঙ্গীচক্রের অত্যাচার। সারা বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালাতে লাগল জঙ্গী সরকার আর পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিটারীর দল।

সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারালো সেই অত্যাচারে।

শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল পূর্ববাংলার মাটি। রক্তের ধারা বইলো পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র আর ইছামতীর কূলে কূলে।

কিন্তু পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষ এ অত্যাচার দেখে

ভয় পেল না। তারা জানে, রক্ত দিয়েই বিপ্লবকে সফল করতে হয়। তারা প্রস্তুত হলো আরও রক্ত দেবার জন্যে। যতো রক্ত চায় তা তারা ঢালবে—কিন্তু তারা চায় এই অত্যাচারের অবসান।

৮ই মার্চ (১৯৭১), সোমবার।

বাংলার জনগণের অতি প্রিয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান আহ্বান জানালেন বাঙালী জাতিকে ঃ

অনেক রক্ত ঢেলেছি আমরা
আরও ঢেলে দিতে প্রস্তুত আজ।
ভীরু, দুর্বল নয়কো বাঙালী
লক্ষ কণ্ঠে জাগে আওয়াজ!

ইয়াহিয়া খানের জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

সামরিক আইন বাতিল করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই হবে, এই হলো অহিংস আন্দোলনকারীদের দাবী।

আন্দোলনকারীরা আজ আর তাঁদের দেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলছেন না—তার বদলে নতুন নাম দিয়েছেন বাংলাদেশ। তাঁদের আন্দোলনের শ্লোগান হলো ঃ 'জয় বাংলা'। তাঁদের সঙ্গীত হলো ঃ

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
(ওগো) আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥'

নতুন উন্মাদনা নিয়ে প্রাণভয় তুচ্ছ করে তাই লক্ষ লক্ষ লোক সেদিন জড়ো হয়েছিল ঢাকায় রমনার রেসকোর্স ময়দানে। আওয়ামী লীগ-নেতা শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে পাঞ্জাবী শাসক-গোষ্ঠীর শোষণ ও স্বৈরাচারী সামরিক অপশাসনের বিরুদ্ধে তারা ঘোষণা করেছে স্বায়ত্তশাসন লাভের সংগ্রাম।

এমন সময় মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন শেখ মুজিবর।

লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি জাগল—জয় মুজিবর রহমান! জয় বাংলা!

পূর্ববাংলার সমস্ত মানুষের অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন:

ভাইরা আমার!

আনি মুজিব বলছি।

আপনারা, সারা পূর্ববাংলার মানুষ আমার ভাই।

শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে আমি এ্যাসেম্ব্লিতে যেতে চাই না।

যত রক্ত দিতে হয় দেব, কার্পণ্য করবো না। কেন না, এ হলো আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এ ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, বাঙালীর অস্থিমজ্জা দিয়ে গড়া ইতিহাস।

আমি প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম, গরীবের ওপর, বাঙালীর ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে। আমাদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আপনি এখানে আসুন—দেখুন।

তিনি এলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে জনতা 'শেম্ শেম্' ধ্বনি দিয়ে উঠল।

মুজিবর বলে চললেন উচ্চকণ্ঠে:

আমি গেলাম পল্টন ময়দানে। বললাম—'কাল থেকে অফিস বন্ধ, কলকারখানা বন্ধ।' আমার কথা সকলে মানলেন। বললাম—'কোনও কিছু চলবে না।' কিছু চলল না।

আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া গোল-টেবিল বৈঠক ডেকেছিলেন। ২৫শে মার্চ তারিখে এ্যাসেম্ব্লি ডেকেছেন। তিনি যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ আমার ওপরে, বাংলার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জনকণ্ঠে আবার 'শেম্ শেম্ ধ্বনি জেগে উঠল।

মুজিব বলে চললেন :

ভাইগণ, মনে রাখবেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৫শে মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া এ্যাসেম্ব্লি কল করেছেন, অথচ বাঙালীর রক্তের দাগ এখনো শুকোয়নি। আমি বলে দিতে চাই, শহীদদের রক্তের উপরে পা দিয়ে মুজিবর রহমান এ্যাসেম্ব্লিতে যাবে না— যেতে পারে না।

আমি বলেছি, এ্যাসেম্ব্লিতে যাবার আগে আমাদের চার দফা দাবী তাঁকে মানতেই হবে।

এক—সামরিক আইন খারিজ করুন।

দুই—সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে যাক্।

তিন—নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন।

চার—সাম্প্রদায়িক নিধনযজ্ঞ বন্ধ হোক।

সবার আগে জনতার প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর দেখব, যোগদান করি কিনা। আমাদের দাবী না মানলে আমরা এ্যাসেম্ব্লিতে বসতে পারি না। জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয় নাই।

ভাইরা, আমার ওপরে আপনাদের বিশ্বাস আছে?

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উঠল জনতাব চীৎকার—আছে, আছে, আছে।

মুজিবর বলে চললেন :

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা মানুষের অধিকার চাই।

আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট, কাছারি, আদালত, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবেরা যাতে কষ্ট না পায়, আমার দেশের মানুষ যাতে কষ্ট না পায়, সেজন্যে রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন চলবে, বিদেশের সঙ্গে

পূর্ববাংলার বাণিজ্য চলবে, কিন্তু সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সরকারী, আধা-সরকারী কোনও প্রতিষ্ঠান চলবে না।

আর যদি একটিও গুলি চলে, যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তাহলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ—প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক পাড়ায় দুর্গ গড়ে তুলবেন। আমাদের যা কিছু আছে, তাই দিয়ে আমাদের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারব, আমরা তাদের পানিতে মারব।

সৈন্যদের বলি, তোমরা আমাদের ভাই—তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু যদি আমাদের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা হয়, তবে ভাল হবে না। সাত কোটি মানুষকে তোমরা চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না।

আমরা মরতে শিখেছি, কেউ আমাদের রুখতে পারে না—পারবে না।

মালিকদের কাছে আমার অনুরোধ, এই হরতালে আমার শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, তাঁদের বেতন যেন পৌঁছে দেওয়া হয়। সব কর্মচারী যেন মাসের ২৮ তারিখে মাইনে নিয়ে আসেন।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল জনতার হর্ষধ্বনি।

মুজিবর বলে চললেন :

সরকারী কর্মচারীদের বলছি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। আন্দোলন কিভাবে করতে হয়, তা আমরা জানি। মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হলো।

হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, অবাঙালী—সবাই আমরা ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের সকলের। দেখবেন, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আমি আবার জানিয়ে দিতে চাই, দেশকে একেবারে জাহান্নামে নিয়ে যাবেন না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারি, জানবেন যে বাঁচার সম্ভাবনা

আছে। এই জন্য অনুরোধ, মিলিটারী শাসন চালাবার আর চেষ্টা করবেন না।

এবার প্রোগ্রামটা কি, তা বলছি শুনুন।

যদি রেডিও আমাদের কথা না শোনে, তবে কোনও বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না, টেলিভিশনে যাবেন না। কেউ যদি আমাদের নিউজ না দেয়, ওদের কাছে যাবেন না।

ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে দুই ঘণ্টা—যাতে সাধারণ মানুষ মাইনেপত্র নিতে পারে।

আর পশ্চিম পাকিস্তানে ·এক পয়সাও যাবে না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রত্যেক মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। আপনাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।

আমরা রক্ত দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো।

এই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

প্রস্তুত থাকুন, ডিসিপ্লিন রাখুন। মনে রাখবেন, আমি কোনও দিন বেইমানি করি নাই। আমি রক্ত দেবার জন্যে প্রস্তুত। জয় বাংলা!

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে জেগে উঠল—জয় বাংলা!

'মৃত্যুকে যে জয় করেছে
ওদের আবার ভাবনা কিসের?
আব্‌ জম্‌জম্ আনবে ওরা
আপনি পিয়ে কলসী বিষের।'

২

ঢাকার রমনার ময়দানে শেখ মুজিবরের এই ঘোষণা এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। বাঙালীর নব-জাগরণের ইতিহাসের একটি জ্বলন্ত দলিল।

১লা মার্চ (১৯৭১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ একটি বিশেষ ঘোষণা করে ৩রা মার্চ তারিখে ঢাকায় পাকিস্থান গণপরিষদের উদ্বোধন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখেন।

যে জুলফিকার আলি ভুট্টো একদিন গণতন্ত্রের নামে প্রচণ্ড চীৎকার করেছিলেন, নির্বাচনে মুজিবরের অসামান্য সাফল্য দেখে গণতন্ত্রের পথ ত্যাগ করে তিনি হয়ে পড়লেন ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী শাসনের দালাল। তাঁর চক্রান্তে ও কুপরামর্শে ইয়াহিয়া খান এ্যাসেম্ব্লির আহ্বানকে বাতিল করে দিলেন।

সারা বাংলা জুড়ে হল হরতাল। প্রতিবাদ ধ্বনিত হল লক্ষ লক্ষ বাঙালীর কণ্ঠে।

এই হরতালের সময়ই ইয়াহিয়াব সশস্ত্র মিলিটারী হিংস্র জনতার উপরে করল নির্বিচার গুলিবর্ষণ। পাঞ্জাবী ফৌজের মেসিনগানের গুলিতে হাজার হাজার প্রাণ হলো বলি।

বিক্ষুব্ধ পূর্ববাংলার লোকদের শান্ত করবার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ ঢাকায় পাকিস্থান গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন। সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন মুজিবর।

তার কারণও অবশ্য ছিল।

নির্বাচন অনুযায়ী তিনি পাকিস্তানের সর্ববাদিসম্মত নেতা। সারা পাকিস্তানের মানে পূর্ব ও পশ্চিম মিলিত পাকিস্তানের।

অথচ ইয়াহিয়া কাজ করে চললেন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী—ভুট্টোর

পরামর্শ অনুযায়ী। মুজিবরের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা তিনি প্রয়োজন মনে করলেন না।

মুজিবর ঘোষণা করলেন, তাঁর দাবী না মানলে তিনি এ্যাসেম্ব্লিতে যাবেন না।

মুজিবর ও তাঁর দলের দাবী হলো—

(১) সামরিক আইন খারিজ করতে হবে।

(২) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।

(৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

(৪) সাম্প্রতিক হত্যার তদন্ত করতে হবে।

(৫) ভবিষ্যতে গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী বন্ধ করতে হবে।

(৬) পূর্ববাংলার সরকারী কাজে সৈন্যদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

(৭) আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার পূর্ববাংলার পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর উপরে ছেড়ে দিতে হবে।

(৮) পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ভুট্টোর সঙ্গে গোপনে বৈঠক করে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ৩রা মার্চ তারিখের গণপরিষদের বৈঠক বন্ধ করে দিলেন। তখন পূর্ববাংলায় মুজিবরের নির্দেশে হরতাল ঘোষিত হল।

অবাঙালী শাসকগোষ্ঠীর নির্লজ্জ ষড়যন্ত্র আর অগণতান্ত্রিক মনোভাবে সারা পূর্ববাংলা বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে উঠল। তারা হরতালে অসম্মত সব অবাঙালীদের দোকানপাট, কারখানা, সিনেমা প্রভৃতির ওপরে হামলা শুরু করল।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া চাললেন এক নতুন চাল।

গণপরিষদ স্থগিত রাখবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের আগের সামরিক শাসনকর্তাকে বরখাস্ত করে সেখানে পাঠালেন নতুন সামরিক শাসনকর্তা টিক্কা খাঁকে।

এই সামরিক শাসনকর্তা হিংস্র প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সামরিক বাহিনীকে ছেড়ে দিলেন পূর্ববাংলার বাঙালী আন্দোলনকারীদের উপরে।

নির্বিচারে মেসিনগান থেকে গুলি চলল চারদিন ধরে অবিরাম। ১লা মার্চ সোমবার থেকে ৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলল এই নৃশংস অত্যাচার।

ইহুদীদের ওপরে হিট্‌লারের অত্যাচার বা বৃটিশ সরকারের জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারও যেন হার মেনে গেল এই ভয়ঙ্কর নৃশংস অত্যাচারের কাছে। পাঞ্জাবী ফৌজের হাতে পূর্ববাংলার দশ হাজার লোকের প্রাণ হল বলি। রক্তের বন্যায় রাঙা হয়ে উঠল পূর্ববাংলার মাটি।

কিন্তু জনগণের বুকে এসে গেছে নতুন জোয়ার।

পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে লাঞ্ছিত, শোষিত, অত্যাচারিত, অবহেলিত পূর্ববাংলার বাঙালী জাতি এই রক্ত-সাগরের মধ্যেও জেগে উঠেছে।

শুরু হল সংগ্রাম।

এই সংগ্রামের নায়ক হলেন পূর্ববাংলার জনগণের অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমান।

৫ই মার্চ হরতালের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিলেন এক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক।

অবিভক্ত বাংলায় (১৯৩০) আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মুজিবর ছিলেন নির্যাতিত কর্মী। পূর্ববাংলার পরলোকগত বিপ্লবী সতীন সেনের সহকর্মী ছিলেন এই শেখ মুজিবর।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে বিভক্ত দুই বাংলার মৈত্রীর

প্রতীক ছিলেন জনাব ফজলুল হক—মুজিবর তাঁরই উত্তরসাধক। মৌলানা ভাসানীর তিনি সহকর্মী।

মুজিবর জানেন, বৃটিশ শাসক ও তাঁর দালালদের অপকীর্তি হচ্ছে, এই বাংলাবিভাগ এবং তার ফলেই পূর্ববঙ্গ আজ পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে শোষিত, অবহেলিত।

পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের নায়ক ফজলুল হক (১৯৫৪) পূর্ববাংলায় স্বায়ত্তশাসন দাবী করার জন্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরূপতায় দু'মাসও কাজ করতে পারেননি। সে আমলে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী (বগুড়া) চক্রান্ত করে ফজলুল হক্‌কে গদিচ্যুত করেন (৩০শে মে, ১৯৫৪)। এ সময়েও ফজলুল হকের দক্ষিণহস্ত ছিলেন তরুণ কর্মী শেখ মুজিবর রহমান।

পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন হয় ১৯৫২ সালে। তার ফলেই সেখানে মুসলিম লীগের পতন ঘটে। তারপর কোনও দিনই মুসলিম লীগের আর শাসনতক্তে বসা সম্ভব হয়নি।

তাই চলল গায়ের জোরে দখলদারি শাসন। ইস্‌কান্দার মিরজার (১৯৫৪-৫৮) শাসন। চলল জবরদস্তি করে দখল-করা আয়ুব খাঁর ফৌজি শাসন (১৯৫৮-৬৮) এবং তার পরে চলল ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক শাসন।

শের-ই-বাংলা ফজলুল হকেরই উত্তরসাধক হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

তিনি জানেন বাঙালীর ব্যথা। বাঙালীর চোখের জল শুধু মাটিতে পড়ে শুকিয়ে গেছে—কোনও দিন সার্থকতা পায়নি।

নির্বাচন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাই মুজিবর দাবী তুললেন—পূর্ববাংলার জন্যে স্বায়ত্তশাসন চাই—আর শোষিত হতে আমরা রাজী নই।

তাই পশ্চিমী চক্রান্তকারী ভুট্টো-ইয়াহিয়ার চক্রান্তে ঢাকার সব রাজপথ বাঙালীর রক্তে পিছল হয়ে উঠল।

কিন্তু তবু বাংলার নেতা মুজিবর নিজের প্রতিজ্ঞায় অচল, অটল দুর্বার।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি তাই ঘোষণা করলেন বিদ্রোহ—অসহযোগ আন্দোলন।

এখন দেখা যাক্, পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিমী শাসকরা কি রকম আচরণ করেছিলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির মূল ভিত্তি হলো দ্বিজাতি নীতি—অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি, এই নীতি।

গান্ধীজী বললেন—ভারতের হিন্দু মুসলমান সবাই এক জাতি —সবাই ভারতীয়।

তার প্রতিবাদ করে মহম্মদ আলী জিন্না বলতেন—না, একথা ভুল। হিন্দু মুসলমান এক জাতি নয়—দুটি আলাদা জাতি।

এই পৃথক জাতির জন্যে চাই পৃথক রাষ্ট্র। তাই ভারতকে বিভাগ করতে হবে।

ভারত বিভক্ত হল—সৃষ্টি হল দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান।

পাকিস্তানের হল দুটি অংশ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই উন্মাদনার সময় পূর্ববাংলার মুসলমান জনসাধারণ হিন্দুদের ওপর শুরু করে দিল নির্যাতন, অত্যাচার। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে এসে আশ্রয় নিল। পূর্ববাংলা হয়ে পড়ল প্রায় হিন্দুশূন্য।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পূর্ববাংলার মুসলমানরা বুঝতে পারল, তাদের একটা বিরাট ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। তা না হলে পূর্ববাংলার বাঙালী মুসলমানদের বুক লক্ষ্য করে কেন হাজার হাজার গুলি বর্ষণ করা হয়েছে।

পাকিস্তানের দুটি অংশ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। অথচ দুই পাকিস্তানের মধ্যে এত বৈষম্যমূলক আচরণ কেন?

পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খরচ :	
১৫শো কোটি টাকা	৫ হাজার কোটি টাকা
উন্নয়ন খরচ :	
৩ হাজার কোটি টাকা	৬ হাজার কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য :	
শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বিদেশী পণ্য আমদানী :	
শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
সরকারী চাকরি :	
শতকরা ১৫ ভাগ	শতকরা ৮৫ ভাগ
মিলিটারীতে চাকরি :	
শতকরা ১০ ভাগ	শতকরা ৯০ ভাগ
চালের দাম :	
৫০৲ মণ	২৫৲ মণ
সরষের তেলের দাম :	
৫৲ সের	২৷৷০ সের
সোনার দাম :	
১৭০৲ ভরি	১৩০৲ ভরি

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের এ এক বিমাতৃসুলভ মনোভাব।

পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ তরুণরা এসব খবর বাংলার দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার দিয়ে জানিয়ে দিলেন। সারা বাংলাদেশের লোক জানল।

যদি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান জিন্না সাহেবের কথামত এক জাতি হন, তা হলে এই বৈষম্য চলবে কেন?

দুই জাতিতত্ত্বের স্রষ্টা মুসলিম লীগের ওপরে তখন পূর্ববাংলার মানুষদের মনে জাগল প্রচণ্ড ঘৃণা।

মুসলমানদের প্রতি প্রীতি দেখিয়ে, 'ইসলাম বিপন্ন' দোহাই দিয়ে যে মুসলীম লীগ তাদের গদি কায়েম করল, দু'দিন বাদেই দেখা গেল, তারা কায়েমী স্বার্থের রক্ষক, নবাব-উজিরদের পোষক, কৃষক আর গরীব মুসলমানদের শোষক মাত্র।

নদীমাতৃক পূর্ববাংলা, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পূর্ববাংলা, ধান, পাট, চা, দুধ, ভাত আর মাছের দেশ সোনার পূর্ববাংলা আজ শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের আর খেয়ালী ধনীদের কায়েমী স্বার্থের শিকার মাত্র।

একান্তভাবে স্বার্থের উগ্র লালসায় উদ্ভূত হয়েছিল জিন্নার দুই জাতিতত্ত্ব।

ধর্মের ভিত্তিতে তৈরী জিন্নার এই জাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন হল—আকাশে বিলীন হয়ে গেল। ভৌগোলিক পরিবেশ আর ভাষা ও সংস্কৃতিগত যে জাতিতত্ত্ব তাই হল সত্য।

সত্য চিরদিনই সত্য—বড় বড় কথা আর বুলি দিয়ে মানুষকে বেশিদিন ভাঁওতা দেওয়া যায় না।

পূর্ববাংলার মানুষ তা হাড়ে হাড়ে বুঝলেন।

বুঝলেন, সাময়িক উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে কি মারাত্মক ভুলই না তাঁরা করে বসেছেন!

পনেরো শত মাইল দূরের শাসকগোষ্ঠী এসে তাঁদের ধর্মের বুলি আউড়ে শোষণ করতে পারেন, স্বার্থসিদ্ধি করতে পারেন—তাঁরা তাঁদের ভালবাসতে পারেন না।

পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকটা অংশই পার্বত্য ও মরুময়। সেখানে খাদ্য খুব কম জন্মায়। তাই জিন্না ধর্মতাত্ত্বিক জাতিভেদের কথা শুনিয়ে, এই নতুন জাতিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাকে শোষণ করতে চেয়েছিলেন। তাই আজ

পশ্চিমীরা গ্রাস করেছে পূর্ববাংলার প্রাণকে। জোঁকের মত তারা শুধু করতে চায় রক্তশোষণ। বাঙালীর রক্তে তারা হবে পুষ্ট—আর তা না দিতে চাইলে জোর করে তাদের রক্ত শোষণ করতে হবে, যেমন করেই হোক না কেন।

তাই আজ পূর্ববাংলা জেগে উঠেছে। তারা চায়, যেমন করেই হোক এই বন্ধন থেকে মুক্তি। তারা আর পূর্ব পাকিস্তান নাম চায় না—চায় পূর্ববাংলা, সোনার বাংলা—বাংলাদেশ।

তাই ঢাকার দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়লো—জয় বাংলা। জয় মুজিবর রহমান। সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

তাই আজ বাঙালীর পণ, যত প্রাণ বলি হোক না কেন—চাই মুক্তি—আমরা চাই স্বাধীনতা। মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না।

‘এসেছে সে একদিন।

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন

৩

এবার আমরা ফিরে যাচ্ছি পুরোনো দিনের কথায়।

বাংলাদেশের বর্তমান অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে পুরোনো দিনের সব ইতিহাসে।

অবিভক্ত বাংলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, সেই সময় ফরিদপুর জেলায় শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম।

তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান। তিনি ছিলেন আদালতের একজন সেরেস্তাদার।

মুজিবর গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন এবং ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি. এ. পাশ করেন।

ইসলামিয়া কলেজে পড়বার সময় থেকেই তিনি রাজনীতি করতেন। তিনি ছিলেন একজন ছাত্রনেতা। কিন্তু হিন্দু মুসলমান বিভেদ ও সংকীর্ণতা তিনি পছন্দ করতেন না।

বি. এ. পাশ করার পর তিনি আইন পড়ার জন্যে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর আর আইন পরীক্ষা দেওয়া হল না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত হল স্বাধীন। ইংরেজ সরকার ভারতকে দু'ভাগ করে একভাগ ভারতীয় ইউনিয়ন আর একভাগ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে এদেশ থেকে চলে যান।

পূর্ববাংলায় স্থাপিত হল মুসলিম লীগের শাসন। তাছাড়া সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এই চারটি প্রদেশ নিয়ে হল পশ্চিম পাকিস্তান।

ভারতের পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান, আর বাংলাদেশের

পূর্বে হল পূর্বপাকিস্তান। দুই পাকিস্তানের মধ্যে হল দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান।

পূর্ববাংলায় তখন শুরু হল মুসলিম লীগের শাসন।

ঢাকার নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন হলেন পূর্বপাকিস্তানের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী।

এই সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁর নেতৃত্বে এই সাম্প্রদায়িক শাসনে চলল করাচীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নির্মম শোষণ।

সুরাবর্দী ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নাম দিয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিলেন। তার ফলেই পাকিস্তান সৃষ্টির সহায়তা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর করাচীব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে তিনি কোনও সুযোগ পেলেন না।

সুরাবর্দী আর তাঁর সহকর্মীরা মনে করলেন, মুসলিম লীগ তার উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ভাগ করে কোনও লাভ হয়নি।

তাই তাঁর নেতৃত্বে প্রথম গঠিত হল আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা প্রথমে খুব বেশি ছিল না।

কিন্তু যতই দিন কাটতে থাকে ততই তাদের আদর্শের জন্যে হাজার হাজার তরুণ এসে এই পার্টিতে যোগ দিতে লাগল।

সুরাবর্দীর আন্তরিকতা থাক বা না থাক, পৃথক বাংলাদেশের আহ্বান শেখ মুজিবরের ভাল লাগল। তা ছাড়া পূর্ববাংলাকে পশ্চিমীরা শোষণ করবে তা তাঁর ভাল লাগত না।

মুজিবর তাই ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাতে যোগ দিলেন। এবার আমরা কি পরিস্থিতিতে

ভারত বিভাগ করে বৃটিশ সরকার পাকিস্তান সৃষ্টি করলেন সেকথা ও তাঁদের বিভেদনীতির বিষয়ে আলোচনা করছি।

বৃটিশ সরকার জানতেন, ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট দেশকে শাসন করতে হলে দেশটিকে নানা ভাগে বিভক্ত করতে হবে। তাঁদের পলিসি ছিল 'Divide and rule'।

তাই তাঁরা প্রথম থেকেই ভারতের মানুষের মনে ধর্মগত বিভেদের নীতি জোর করে চাপিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ তপশিলী জাতিদেরও তাঁরা পৃথক করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের মনের সংকীর্ণতা দূর হওয়ায় তা তাঁরা ততটা পারেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সরকার জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। বাংলায় শুরু হল সৈন্যদের রাজত্ব। যুদ্ধের জন্য মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিল ইংরেজ। বাংলার ১৩৫০ সালে সারা দেশে শুরু হল মন্বন্তর। ক্ষুধার্ত মানুষেরা অনাহারে রাজপথে পড়ে মারা গেল।

একদিকে জাপানের বোমার ভয়—অন্যদিকে কঠোর সামরিক শাসন। কাপড়, চাল দুষ্প্রাপ্য হল। সর্বত্র চলল কণ্ট্রোল আর লাইন। বাঙালীর জীবন হল অতিষ্ঠ।

সেইদিন ভারতবাসীকে এই দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্যে ভারতের পূর্বসীমান্তে এসেছিল নেতাজী সুভাষের আজাদ-হিন্দ ফৌজ।

কিন্তু সেদিন কাপড় আর রেশন জোগাতে বিব্রত ভারতবাসী তা ভাল করে জানতেও পারেনি।

যুদ্ধ শেষ হল। ইংরেজ জিতল। সাধারণ মানুষের চোখে নেমে এলো আশার আলো। বিশেষ করে অত্যাচারিত বাঙালী ভাবল, আবার সুখের দিন আসবে।

কিন্তু সেদিন ইংরেজ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা

থামালো না। লালকেল্লায় চলল বিদ্রোহী আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের নামে প্রহসন।

এই বিচারের সূত্রে প্রকাশ পেলো, আজাদ হিন্দ বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। দেশে জাগলো নতুন উদ্দীপনা। সবাই শুনলো, কিভাবে নেতাজীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে।

সবাই আনন্দিত হল।

সারা দেশে জাগল ধ্বনি—আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই! শাহ্‌নওয়াজ, সেহ্‌গল, ধীলনের মুক্তি চাই!

২১শে নভেম্বর, ১৯৪৫। কোলকাতার ছাত্ররা সৈন্যদের মুক্তির দাবীতে বের করল শোভাযাত্রা। জনসাধারণ এসে দাঁড়াল তরুণদের পাশে। সেই মিছিলের ওপরে গুলি চালাল ইংরেজ। কোলকাতার রাজপথে শহীদ হলেন একজন ছাত্র—রামেশ্বর ব্যানার্জী।

রামেশ্বর শহীদ হলেন—জেগে উঠল সারা কোলকাতা, সারা বাংলা। ট্রাম, বাস পুড়ল। দোকানপাট, স্কুল, কলেজ, কলকারখানা বন্ধ হল। গুলিতে আরও কত প্রাণ হল বলি।

ইংরেজ বাধ্য হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধাদের মুক্তি দিল শেষ পর্যন্ত।

এদিকে সারা ভারতে শুরু হল নব আন্দোলন—'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'।

এর আগে তারা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল যে, যুদ্ধে জিতলে তারা স্বায়ত্তশাসন দেবে। এখন সেই আন্দোলন চলল পূর্ণ গতিতে।

এদিকে বোম্বাইতে ভারতীয় নৌ-সেনারা বিদ্রোহী হল। বিমানবাহিনীও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সকলের মুখে এক কথা—স্বাধীনতা চাই। ভারত ছাড়বার জন্যে তৈরী হল ইংরেজ।

সারা দেশে হল নতুন নির্বাচন। এই নির্বাচনে জিতল কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি কংগ্রেস আর মুসলিম লীগকে স্বায়ত্ত-শাসন দেবার জন্যে আহ্বান জানালেন। মন্ত্রীমিশন ভারতে এলেন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে।

ভারতবর্ষকে দেওয়া হল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। স্থির হল এক বৎসর পরে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। গঠিত হল ইণ্টেরিম্ গভর্নমেণ্ট।

কিন্তু মুসলিম লীগ এই সরকারে যোগ দিল না। তারা দাবী করল—পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই।

১৯৪৬-এর ১৫ই আগস্ট তারা ঘোষণা করল—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

বাংলার শাসন তখন মুসলিম লীগের হাতে। তার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য কোলকাতায় দাঙ্গা বাধালেন। চলল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

তারপরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল নোয়াখালি আর বিহারে। হাজার হাজার প্রাণ হল বলি।

এই প্রাণবলিতে নেতারা কাতর হলেন। তাঁরা ভারতবিভাগে সম্মতি দিলেন।

এর জন্যে দায়ী ইংরেজের সৃষ্ট বিভেদনীতি। সত্যিকারের দেশপ্রেমিকরা তাই দুঃখে-কষ্টে ভেঙে পড়লেন।

কংগ্রেস ভারতবিভাগে সম্মত হলেন। ভাবলেন, ইংরেজ ত যাক—পরে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেওয়া যাবে।

সৃষ্ট হল ভারত আর পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটি অংশ—পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান।

বাংলাদেশ হল দ্বিখণ্ডিত।

পূর্ববাংলার নাম হল পূর্বপাকিস্তান। দেশীয় রাজ্যের বেশির ভাগ ভারতে যোগ দিল।

ভারতকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ইংরেজ অর্পণ করল শাসনভার।

হিমালয় থেকে কুমারিকা, আসামপ্রান্ত থেকে সুদূর বেলুচিস্তান সেদিন বেদনামুক্তির আনন্দে মুখর হয়ে উঠল।

* * *

স্বাধীন ভারত আর নব-গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে শুরু হল ঠাণ্ডা যুদ্ধ।

এদিকে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির প্রতীক মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন। দুই দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্প্রীতির আশা হল সুদূরপরাহত।

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের লোকবিনিময় হল। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু রইলো না।

এদিকে পূর্ববাংলায় শুরু হলো দাঙ্গা। মাঝে মাঝেই চলে দাঙ্গা। পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে জাগল ভয়। তারা দেশত্যাগ করে দলে দলে আসতে লাগল ভারতে।

বরিশালের বিপ্লবী সতীন সেন। তাঁর ধারণা এই সবকিছু বৃটিশের সৃষ্ট। পাকিস্তানে থেকে সেখানে অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন।

অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা এসে দাঁড়ালেন সতীন সেনের পাশে।

১৯৪৯ সাল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ এলেন পূর্ববঙ্গে। সতীন সেন তাঁর কাছে পেশ করলেন দাবীপত্র। পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমানকে এক চোখে দেখতে হবে।

ফল হল উল্টো। বরিশালে সুরু হল ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার খবর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট সতীন সেনকে একটি মিথ্যা বিবৃতি দিতে বললেন।

তিনি তা অস্বীকার করলেন। ফলে তিনি হলেন কারারুদ্ধ। তাঁর জীবনের নবম কারাবাস।

আট মাস পরে যখন তিনি মুক্তি পেলেন, তখন হিন্দুনিগ্রহের

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন পূর্ববাংলার তরুণ মুসলিম বাঙালীরা। সতীন সেনের নেতৃত্বে তাঁরা তৈরী করলেন শান্তি-মিশন।

পূর্ববাংলায় সংগ্রামী অসাম্প্রদায়িক মুসলিম তরুণদের আবির্ভাব ঘটল। তাদেরই একজন হলেন আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

৪

স্বৈরাচারী মুসলিম লীগের শাসনে (১৯৪৭-১৯৫১) সারা পূর্ববাংলার বুকে চলল অকথ্য অত্যাচার।

স্বৈরাচারী লীগ সরকার অত্যাচারের স্টীম রোলার চালালেন পূর্ববাংলার বুকের ওপর দিয়ে। সবরকম গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আন্দোলন, কৃষক-মজুরদের ভালভাবে খেয়ে বেঁচে থাকার আন্দোলন, মধ্যবিত্তদের পূর্বের শান্তিময় জীবন —সবকিছুকে পিষে ধূলিসাৎ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন মুসলিম লীগ সরকার।

সরকারের সামান্যতম বিরোধিতা করাও বেআইনী—সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শাস্তি। পূর্ববাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত না হলেও কার্যত তারা বেআইনী হয়ে পড়ল। ট্রেড্ ইউনিয়ন, কৃষাণ সভা সব বন্ধ। কোনও বিরোধিতা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী।

গোটা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক চেতনাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এলো শোষকশ্রেণী।

পশ্চিম পাকিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান থেকে এলো হাজার হাজার মানুষ। ভারতেরও বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক মুসলমান সেখানে গেল।

পশ্চিমীরা খুলল কলকারখানা। চালাল একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবসা। বাঙালীর বুকের রক্ত একদিকে নিংড়ে নিতে লাগল তারা—অন্যদিকে পশ্চিমী সরকার ঐ রক্তে নিজেদের দেহ পুষ্ট করতে লাগল।

একদিন পূর্ববাংলার যে-সব রাজনৈতিক কর্মী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন প্রাণ তুচ্ছ করে, তাঁদেরও দলে দলে পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করতে হল।

সকল রকম রাজনৈতিক সংগ্রাম নিষিদ্ধ সেখানে। যখনই সাধারণ মানুষের সংগ্রাম দানা পাকিয়ে ওঠে—'ইসলাম বিপন্ন' জিগীর তুলে পূর্বপাকিস্তানে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয় বিদেশাগত মুসলমানের সাহায্যে—তাদের মদৎ দেয় লীগ সরকার।

বাঙালী মুসলমানেরা ভাঁওতা বুঝতে পারে না।

তাদের মন স্বভাবতঃই সরল—তারা হল নীরব দর্শক।

দেখতে দেখতে পূর্বপাকিস্তানের বারো আনা হিন্দু ওদেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেয়।

ইতিমধ্যে বাংলার বুকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন কায়েম করার জন্যে মহম্মদ আলি জিন্না উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলেন।

সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলা ভাষা। তা ছাড়া আছে সিন্ধী, বেলুচি, পুস্তু প্রভৃতি নানা ভাষা। শতকরা ২৫ ভাগ লোক উর্দুতে কথা বলে কিনা সন্দেহ। অথচ সেটাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

কিন্তু এত অত্যাচারের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের কৃষক, মজুর

জনতা শত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করেও আন্দোলনের পথে এগিয়ে গেলেন।

কৃষকশ্রেণী হল পূর্বপাকিস্তানের বৃহত্তম শ্রেণী। তারা তাদের বাঁচার দাবীতে, উন্নতির দাবীতে আন্দোলন শুরু করল। পূর্ব-পাকিস্তানের চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় দ্বিগুণ। পূর্ব-পাকিস্তান উৎপন্ন করে পাট, চা প্রভৃতি। অথচ তা থেকে উপার্জিত বিদেশী অর্থের অধিকাংশ নিয়ে পশ্চিমীরা আমীরী চালে থাকেন।

ছাত্রসমাজও এগিয়ে গেলেন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির দাবীতে।

• সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গ্রেপ্তার।

অসংখ্য কম্যুনিস্ট নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হল। ভরে উঠল জেলখানাগুলো।

তারপরেই চলল অত্যাচারের নগ্নরূপ। বন্দীদের উপরে চলল নানা অত্যাচার আর গুলি।······

রক্তরাঙা ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫০।

সারা জগৎ সেদিন স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনতে পেলো, রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পুলিশের বর্বর গুলিচালনা ও অত্যাচারের ফলে সাতজন রাজনৈতিক বন্দী জীবন দিয়েছেন।

ঘটনাব বিবরণ প্রথমটা লীগ সরকার চাপতে চেষ্টা করল। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের চেষ্টায় যে বিবরণ মিলল, তেমন অত্যাচারের কাহিনী বোধ হয় একমাত্র হিটলারের অত্যাচারের সঙ্গেই তুলনীয়।

জেলখানায় প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ করে বন্দীদের ওপরে মোট ১০৫ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। চারজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যান, তিনজন পরে প্রাণ হারান—আহত হয় অসংখ্য।

এই অত্যাচারে মারা যায় রাজশাহীর বৃটিশ আমলের বিপ্লবী বিজন সেন, কুষ্ঠিয়ার দিওয়ার হোসেন ও মহম্মদ হানিফ,

মৈয়মনসিংহের ছাত্রনেতা সুখেন্দু ভট্টাচার্য, খুলনার আনোয়ার হোসেন ও ঢাকার সুধীন ধর।

বিভিন্ন স্থানে ছাত্র, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্যে এই সব বিপ্লবীদের বন্দী করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে খুলনা জেলে মুগুর পিটিয়ে হত্যা করা হয় কৃষক-নেতা বিষ্ণু বৈরাগীকে।

১৯৫০ সনে ঢাকা জেলে নিহত হল ছাত্রনেতা শিবেন রায়।

বরিশাল জেলে কম্যুনিস্ট কর্মী সুশীল দাসকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এমন আঘাত করা হয় যে, তিনি রক্তবমি করতে করতে মারা যান।

বিখ্যাত নাচোলে কৃষকবিদ্রোহের অপরাধে ধৃত বিচারাধীন তরুণ বন্দী দারুণ অত্যাচারের ফলে মারা যান রাজশাহী জেলে।

মৈমনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন কম্যুনিস্ট নেতা ফণী গুহ।

১৯৫১ সনে এই মৈমনসিংহ জেলেই নির্যাতনের ফলে মারা যান কৃষক-নেতা পল্লীকবি চন্দ্র সরকার। তাঁর সঙ্গেই মারা যান কেনারাম মোড়ল, সুরেন্দ্র ভানু, রুবীন হাজং, গুণী বরাট এবং আরও দশ জন কৃষককর্মী।

অকথ্য অত্যাচার করে হত্যা করা হয় কম্যুনিস্ট সামস্তি শেখকে। যশোহর জেলে কৃষককর্মী আরশাদ মোল্লা আর মোজাম মোল্লা মারা মান।

শুধু জেলেই অত্যাচার সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। জেলের বাইরেও যারা গণতান্ত্রিক লড়াই করেছেন, তারাই অত্যাচারিত হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে শত শত লোক প্রাণ দিয়েছে—আহতের সংখ্যা সীমাহীন।

রাজশাহীর নাচোল এলাকাতে পুলিশের বর্বর গুলিচালনায় একশত পঞ্চাশ জন কৃষক প্রাণ হারান। দলে দলে সাঁওতাল কৃষক রাজশাহীর বরিন্দা অঞ্চল ছেড়ে ভারতের মালদহে এসে আশ্রয় নেয় অত্যাচারের ভয়ে।

গ্রামের পর গ্রাম পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নারী, শিশু নির্বিশেষে চলল হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার।

কম্যুনিস্ট কর্মী ইলা মিত্রের ওপরে যে অমানুষিক অত্যাচার চলেছিল, বিশ্বের ইতিহাসে কোনও নারীর উপরে এ ধরনের অত্যাচারের তুলনা বিরল।

মৈমনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহী হাজং কৃষকদের উপরেও চলেছিল প্রচণ্ড অত্যাচার।

গুলিতে একশ তিন জন প্রাণ হারান। তা ছাড়া বালুচ সৈন্যদের অত্যাচারে দুর্গম পাহাড়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় অনাহারে, অচিকিৎসায় মারা যায় পনেরো শত কৃষক। তাদের মধ্যে ছিল অনেক নারী ও শিশু।

শ্রীহট্টের নামকরা বিরোধী আন্দোলনে পবিত্র, অমূল্য, প্রসন্ন, কাটু মাঝি ও আরও পাঁচজন কৃষককে গুলিতে প্রাণ দিতে হয়। শ্রীহট্ট সীমান্তে কম্যুনিস্ট নেতা রবি দাসকেও গুলিতে প্রাণ দিতে হয়।

পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন করতে গিয়ে নেতা সতীশ বাইন ও তাঁর দুই ভাইপো প্রাণ দেন।

চট্টগ্রামের কৃষক আন্দোলন বন্ধ করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় ডঃ আবুল খায়ের, ভাগচাষী সুলতান আমেদ ও আরও এগারো জনকে।

চরম দমননীতির ফলে বহু কর্মী সেদিন আত্মগোপন করে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাঁদের অনেকে মারা যান।

এমনি করেই মারা যান রাজশাহীর কম্যুনিস্ট নেতা শুভাংশু মৈত্র, বরিশালের নেতা ফণী চক্রবর্তী ও অমৃত নাগ, খুলনার কৃষ্ণ ব্যানার্জী, মৈমনসিংহের জহরুদ্দিন ও ভূপেন ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকে।

বাঁচার আন্দোলনে সেদিন দেখা গেল আর একটি নতুন সংগ্রাম—যা মুসলীম লীগ সরকার কখনো কল্পনা করতেও পারেননি।

পূর্ববাংলার বুকে শুরু হল পুলিশ ধর্মঘট। সশস্ত্র বাঙালী পুলিশদেরও বেশির ভাগই এই আন্দোলনে যোগ দিলেন।

মুসলিম লীগ সেদিন যে নৃশংসতা দেখিয়েছিল তার তুলনা বিরল।

পুলিশদের কাছে খবর পাঠানো হল তাদের সঙ্গে সরকার মিটমাট করতে চায়। তাদের মিটমাটের নামে এক জায়গায় জড়ো করা হল। তারপর তাদের উপরে লেলিয়ে দেওয়া হল সশস্ত্র মিলিটারীদের।

নিরস্ত্র অবস্থায় পুলিশবাহিনীর দ্বারা তরুণদের পশুর মতো হত্যা করা হতে লাগল। কত যে সেদিন নিহত হল তার সীমা-সংখ্যা নাই।

সরকারী হিসাবে বলা হয় পঁচিশ জন নিহত—কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা তার অনেক বেশি। আহতের সংখ্যা ছিল শতাধিক।

এই ভাবে চলল দিনের পর দিন।

কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের নৈতিক দাবীকে, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার আর মাতৃভাষার দাবীকে চেপে রাখতে পারলে না। তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হল।

অমর শহীদদের আত্মত্যাগে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ সেদিন উদ্বুদ্ধ।

তা ছাড়া ১৯৪৯ সনে সৃষ্ট হয়েছিল আওয়ামী লীগ। তারাও জোর দাবী তুলল, এ অত্যাচারের অবসান চাই। মুসলীম লীগ তখন কিছু কিছু রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে ও পূর্বপাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন। এমন কি নাচোল মামলায় বন্দী শ্রীমতী ইলা মিত্রকেও এই সময় চিকিৎসার জন্যে পেরোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

কিন্তু মুসলীম লীগ এতদিনে জনগণের চোখে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

তাই পূর্বপাকিস্তানের নির্বাচনে ১৯৫৪ সনে মুসলীম লীগ হল পরাস্ত। জয়েন্ট ফ্রন্টের নেতা ফজলুল হক সাহেব হলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সেসব ঘটনা এর পরে বিস্তৃত বলা হচ্ছে।

তখন এই ফজলুল হক সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন আওয়ামী লীগ-নেতা তরুণ কর্মী শেখ মুজিবর রহমান।

৫

আ-মরি বাংলা ভাষা।
মোদের গরব, মোদের আশা।
কি যাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে—
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
আ-মরি বাংলা ভাষা।

এপার বাংলা—ওপার বাংলা। একই বাংলাকে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু দুই বাংলারই এক ভাষা—তা হল মধুর বাংলা ভাষা।

তাই এই ভাষার সঙ্গে প্রতিটি বাঙালীর যেন নাড়ীর টান—অন্তরের সম্পর্ক।

পূর্বে কর্ণফুলী, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার সীমান্ত, উত্তরে

তুষারশুভ্র হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—এই নিয়ে ছিল আমাদের অখণ্ড বাংলা.দেশ।

যে বাংলাদেশের বর্ণনা করে কবি গেয়েছেন—

‘মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে—
বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুকমালা,
ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গে মুকুট কিরণে ভুবন আলা,
কোলভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ
চরণে পদ্ম, অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাঁহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।’

এই বাংলাকে একদিন টুকরো টুকরো করে ভেঙে দুটুকরো করতে চেয়েছিলেন লর্ড কার্জন—উদ্দেশ্য ছিল মেধাবী বাঙালী জাতিকে দুর্বল করা। কিন্তু সেদিন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনে তা সফল হয়নি।

১৯৪৭ সনে বৃটিশের চক্রান্ত হল সফল। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মনে বিভেদ সৃষ্টি করে বাংলা বিভাগ তাঁরা কায়েম করলেন।

বাঙালী প্রাণের চেয়েও ভালবাসে তাদের মাতৃভাষা এই বাংলা ভাষাকে।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু বাঙালী বাধ্য হয়ে হল নীরব। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালী মুসলমান তাদের ভাষার দাবী ত্যাগ করলেন না। তাঁদের দাবী হলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। এই নিয়ে শুরু হলো পুর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন।

মহম্মদ আলী জিন্না পূর্ববাংলা সফরে এলে কয়েকজন বাঙালী

ছাত্র তাঁর মুখের ওপরে বলে বসলেন—বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতেই হবে।

জিন্না ত এ দাবী শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি তাদের ধম্‌কে দিয়ে বাংলা থেকে বিদায় নিলেন।

কিন্তু ঢাকার রাজপথে বিপ্লবের পথে নামলেন বাংলার মুসলীম তরুণ দল। চলল বিরাট মিছিল—সকলের মুখে বাংলা গান, বাংলা ছন্দ। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী হলো এই বৈপ্লবিক দিনটি।

চলল অত্যাচার—চলল নির্বিচারে গুলিবর্ষণ।

উনিশজন বাঙালী তরুণ শহীদের রক্তে সিক্ত হয়ে উঠল ঢাকার রাজপথ।

বাংলা ভাষার দাবীতে বুকের রক্ত ঢাললেন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বর এবং আরও কত নাম না জানা লোক।

কিন্তু তরুণ দল নির্ভীক।

পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী সারা পূর্বপাকিস্তানে চলল প্রবল আন্দোলন। এই আন্দোলনে প্রাণ দিলেন যশোহর, ঢাকা এবং উত্তরবঙ্গের মোট কুড়িজন তরুণ বাঙালী।

শহীদের রক্তে লাল হয়ে উঠল মাটি। কিন্তু আন্দোলন থামল না।

অবশেষে বাংলা ভাষার হল জয়। বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন পশ্চিমী শাসক-গোষ্ঠী।

এদিকে পদ্মা, মেঘনার তীরে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ কবি ও সাহিত্যিকরা লেখনী ধরলেন। ভাষার সংগ্রাম নিয়ে সে লেখার শুরু—তারপর সে লেখার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের দাবী।

সালাম, রফিক, জব্বর বরকতের আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হয়নি পূর্বের অন্যান্য আরও শহীদের আত্মাহুতি।

বাঙালী বুঝতে শিখলো পশ্চিমী শাসকদের চক্রান্ত—তাদের নির্লজ্জ নগ্নরূপ।

বাংলাকে তারা করতে চায় পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। তারা প্রভু—বাঙালীরা ভৃত্য—ঠিক যেন এই সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল জীবন্ত সত্যরূপে।

*   *   *

ঠিক এই ঘটনার পরেই ঘটল সাধারণ নির্বাচন (১৯৫৪)।

মুসলীম লীগের শাসক আর করাচীর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের শোষণে নিপীড়িত বাঙালী মুসলীম তরুণরা জেগে উঠেছে এতদিনে।

সারা দেশে তারা চলাল মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য।

নির্বাচনে মুসলীম লীগ বিপুল সংখ্যার কম ভোট পেয়ে পরাস্ত হলো। যুক্তফ্রন্টের হল জয়। শের-ই-বাংলা ফজলুল হক্ হলেন পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। শেখ মুজিবর রহমান এই নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তান বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। পরে তিনি হন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদেরও সদস্য। আইন পড়ায় ইস্তফা দিয়ে তখন থেকে তিনি নেমে পড়েন প্রকাশ্য রাজনীতিতে।

কিন্তু পশ্চিমী শাসকবর্গ এই সরকারকে প্রথম থেকেই সুদৃষ্টিতে দেখলেন না।

ফজলুল হকের বিরুদ্ধে শুরু হলো করাচীর কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত।

অবশেষে কোলকাতায় তিনি যখন চিকিৎসার জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন সেখানে তাঁর দেওয়া কয়েকটি ভাষণকে চক্রান্তকারীরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা বলে ঘোষণা করল। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে

দিয়ে গভর্নর ইস্‌কান্দার মীরজা নিজের হাতে শাসন-ভার তুলে নিলেন।

হক্ সাহেবের সঙ্গে মুজিবরও এসেছিলেন কোলকাতায়। সব ঘটনা তিনি বুঝতে পারলেন। অত্যন্ত মর্মাহত হলেন তিনি। কিন্তু তখন আর কিছুই করার নেই।

তিনি নীরবে প্রহর গুণতে লাগলেন সুদিনের আশায়।

কিভাবে জনাব ফজলুল হক্ সাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছিল, তা এবারে বলা হচ্ছে।

* * *

বাংলা দেশের অর্ধ শতাব্দীর রাজনীতিতে জনাব ফজলুল হক্ ছিলেন বিপুল জনপ্রিয় একজন মানুষ।

তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উত্তরসূরী,—অপূর্ব দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক।

১৯৪৭ সনে দেশ দ্বিধাবিভক্ত হলে ফজলুল হক তাঁর আবাল্যের কর্মভূমি কোলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে যান। সেখানেই তিনি কৃষক, প্রজাপার্টি, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি বিরোধী দলগুলিকে একত্র করে মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেন।

১৯৫৪ সনের নির্বাচনে লীগ পেলো মাত্র ৯টি আসন আর যুক্তফ্রণ্ট পেলো ২১৮টি আসন।

এই নির্বাচনেই পূর্ব বাংলার মুসলীম লীগ শাসনের সমাধি ঘটল।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি নদীমেখলা শস্যস্যামলা পূর্ববাংলার বুকে এক নতুন আদর্শের জন্ম হল সেদিন।

১৯৫৪ সনের ৩রা এপ্রিল বিরাশী বছর বয়সে হক্ সাহেব তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

সারা পূর্ববাংলার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও সেদিন তাঁর মন্ত্রিসভাকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাল। বাঙালী মাত্রের

হৃদয়েই—পূর্ব-পশ্চিম বা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, জনাব ফজলুল হক্ সাহেবের প্রতি ছিল একটা বিশেষ স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

এদিকে পূর্ববাংলার চক্রান্তকারীরা নানা জায়গায় বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে, ওয়ার্ডারদের মধ্যে নানা ছুতোয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে দিতে লাগল। চলতে লাগল তারা চক্রান্ত-জাল বিস্তার করে।

১৯৫৪ সনের ৩০শে এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠনের ঠিক সাতাশ দিন পরে হক্ সাহেব এলেন কোলকাতায়।

তাঁর পায়ে গুরুতর ব্যথায় তিনি বেশ কিছুদিন ধরে অত্যন্ত যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তিনি চলাফেরা করতেও পারছিলেন না—ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে তাঁকে চলাফেরা করতে হচ্ছিল।

তিনি তাই কোলকাতা রওনা হলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবার জন্যে।

তাঁর পায়ের যন্ত্রণার কারণও তিনি বর্ণনা করেন।

মুসলীম লীগের শাসনকালে, যখন বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন চলছিল, তখন পুলিশ শোভাযাত্রাকারীদের ওপরে বহুবার নির্মমভাবে লাঠিচালনা করে। একটি শোভাযাত্রায় ফজলুল হক্ সাহেবও ছিলেন। লাঠি চালনার ফলে তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। সেই আঘাত থেকেই পরে এই নিদারুণ অবস্থা হয়।

জনাব ফজলুল হক্ সাহেব দমদমে এসে নামলে, সেখানে এক বিরাট জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ফুলের মালা আর স্তবকে তিনি হলেন বিভূষিত।

সাংবাদিকদের তিনি বললেন—চিকিৎসার জন্যে আমি এসেছি বটে, তবে দীর্ঘদিন পরে আমি আমার পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করব।

এই শহরে আমি সুদীর্ঘ ৬০ বছরেরও বেশি, আমার জীবনের

সবচেয়ে আনন্দময় দিনগুলি কাটিয়েছি। সেই সব দিনগুলির কথা আমি ভুলতে পারি না। আমি এখানে এসেছি সেই সব স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে আর মনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে। ইন্‌শাল্লাহ, ভবিষ্যতে আবার আমি আসব।

প্রেসকে তিনি একটি বিবৃতিও দিলেন।

তিনি বললেন—আপনাদের দোয়ায় আর আল্লাহ্‌-এর কৃপায় আমি সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। আমি কথা দিচ্ছি যে, আমি যাই লাভ করে থাকি না কেন, তা আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে গ্রহণ করব। উপযুক্ত অংশ আপনাদের দিতে আমি কৃপণতা করব না। দুই বাংলার সম্পর্কের বিষয়েও উপযুক্ত সময়ে আমি সব বলব। সে মস্ত বড় কাহিনী। আমি ডাঃ রায়ের সঙ্গেও দুই বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

পরদিন সকাল।

ফজলুল হক্‌ সাহেব রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন।

বহুদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা—দুজনে দুই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে দুই বাংলার নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। মোটামুটি কয়েকটি প্রধান সমস্যা নিয়ে তারা আলোচনা করলেন।

তা হল ঃ

(১) দুই বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে ভিসা ও পাশপোর্ট প্রথা বিলোপ করা।

(২) দুই বাংলার মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) সীমান্তের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধগুলিও শিথিল করার চেষ্টা করা।

সেদিন পূর্ব, পশ্চিম উভয় দেশের বাঙালীর কাছে জনাব ফজলুল

হক্ যেন দুই বাংলার একজন মৈত্রীর প্রতীক রূপে প্রতিভাত হলেন।

ডাঃ রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ একঘণ্টা কথাবার্তা শেষ করার পর তিনি সাংবাদিকদের কাছে একটি ভাষণ দিলেন।

দুই ব্যাংলার মধ্যে এই যে একটা বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে, পাশপোর্ট ও ভিসা তার একটি প্রধান কারণ। এই প্রথার যৌক্তিকতা আমি বুঝি না। দুই দেশের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি দুই বাংলার মধ্যে যোগাযোগের সব বাধানিষেধ দূর করতে সচেষ্ট হবো। আমার এ প্রচেষ্টায় আমার বন্ধু বিধানবাবু নিশ্চয় সহযোগিতা করবেন।

পরদিন শান্তি সেনার পক্ষ থেকে আয়োজিত একটি সভায় তিনি ভাষণ দিলেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে হক্ সাহেব বললেন—আমি জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত। আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি যদি দুটি বাংলার মধ্যেকার এই মিথ্যার প্রাচীর অপসারিত করবার কাজ শুরু করতে পারি, তা হলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

দুই বাংলার মধ্যেকার এই যে ব্যবধান এটা একটা কৃত্রিম ব্যবধান—এটা একটা ধোঁকামাত্র। করুণাময় খোদা-তাল্লার কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন এ ব্যবধান দূর করতে আমার সহায় হোন। আমার এই আকাঙ্ক্ষা যাতে পূর্ণ হয়, তার জন্য আপনারা সকলে আমাকে দোয়া করুন।

এই ভাষণে হয়তো আবেগ ছিল, হয়তো সৎ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাকিস্তানকে ধ্বংস করার মতো কোন কথাই ছিল না।

আর একটি সভায় তিনি বললেন:

বাঙালীরা পূর্বে বা পশ্চিমে যে যেখানেই থাকুক না কেন তারা অখণ্ড।

বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দুভাগ হয়েছে মাত্র, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে দুটি বাংলার মধ্যে কোন তফাত নেই। রাজনীতিকরা দেশকে দুভাগ করে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি! ভবিষ্যতেও কোন দিন পারবেন না।

এলগিন রোডে নেতাজী-ভবনে, একটি সভায় ভাষণ দিতে আসেন হক্ সাহেব। সেখানে এসে তাঁর অতীত দিনের সব কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় নেতাজী ও শরৎচন্দ্র বসুর কথা।

তিনি বললেন—এই ভবনে অতীতে কত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কত বিষয়ে আলোচনা করেছি—ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাছে মাতৃভূমির সেবায় নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রেরণা লাভ করেছি।

সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ওঠার শক্তি এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অর্জন করেছি। সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বসুর কাছে শিখেছি, জাতি হিসাবে বাঙালী একটি জাতি—এর মধ্যে অন্য কোনও বিভেদ নেই।

তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে চললেন—একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করি না। বাংলা দেশ বলতে—হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এই উভয় দেশকেই আমি বুঝি। যারা আমাদের এই সোনার দেশকে দুভাগ করেছে—তারা দেশের দুষমন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না। এই শব্দটি বিভ্রান্তির জাল সৃষ্টি করবার ও স্বার্থ সিদ্ধির একটি পন্থা মাত্র। এবার আমি কাজ শুরু করলাম এবং ভারত-পাকিস্তান মুক্ত বাংলার ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে আমার কর্তব্য বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকব। সারা পৃথিবী জুড়ে যে নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে, ভারতকে যদি তাতে যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হয়, তবে আল্লা যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, আমি ভারতের এই অংশের নেতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দাঁড়িয়ে ভারতকে—অর্থাৎ হিন্দুস্তান পাকিস্তান

মিলিত ভূখণ্ডকে, বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করব।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটি সমিতির উদ্যোগে হক্ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একটি সভা হয়। এই সভায় হক্ সাহেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়।

এই সভাতেও তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

কোলকাতা শহরের প্রতি আমার যে ঋণ, তা আমি কোনও দিনই শোধ করতে পারব না।

আপনাদের সেবা, আপনাদের খিদমতই আমার লক্ষ্য। বাংলার মঙ্গল, বাংলা ভাষার সেবা, বাঙালী জাতির উন্নতিই আমার জীবনের একমাত্র কাজ—একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

সত্যের পথে ন্যায়ের পথে আমি যাতে চলতে পারি আপনারা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন। দোয়া করুন এবং বিশ্বাস করুন যে, আমি আপনাদের হয়েই পূর্ববঙ্গে আছি।

কোলকাতায় তাঁর কাটল একটি স্মরণীয় সপ্তাহ।

কোলকাতা থেকে ঢাকায় ফেরার আগে একটি বিদায়বাণীতে তিনি বললেন:

বিষাদ ভারাক্রান্ত অন্তরে কোলকাতার অগনিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমি বিদায় নিচ্ছি। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। স্থানীয় অধিবাসীদের ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগসূত্র এতই গভীর ও দৃঢ় যে রাজনৈতিক বিভাগ তা বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কোলকাতায় আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলবার সময় সব সময় আমি খোলাখুলি মন নিয়েই কথা বলেছি।

* * *

কিন্তু ইতিমধ্যেই ঢাকা ও করাচীর প্রতিক্রিয়াশীল মহল যে সুযোগ খুঁজছিলেন, তা তাঁরা পেয়ে গেলেন।

তাঁরা ঘোষণা করলেন, কোলকাতায় প্রদত্ত ভাষণগুলির ভাবার্থ অত্যন্ত খারাপ। হক্ সাহেবকে 'বিশ্বাসঘাতক, বেইমান, পাকিস্তানের পয়লা নম্বরের শত্রু' ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিভূষিত করা হল।

ঢাকায় ফিরে গিয়েই যেন একটা ঝড়ঝঞ্ঝাপ্লাবিত কঠিন পরিবেশের সামনে পড়লেন ফজলুল হক্।

পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ এবং প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী (বগুড়া) হক্ সাহেবকে করাচীতে তলব করলেন।

গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাতদিন ধরে হক্ সাহেবের চলল প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা। শের-ই-বাঙাল ফজলুল হক্, পূর্ববঙ্গের জন্যে স্বায়ত্তশাসন দাবী করলেন।

এই সময় হক্ সাহেবের সঙ্গী ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান।

৩০শে মে অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠনের মাত্র ২৬/২৭ দিন পরে গভর্নর জেনারেল, ফজলুল হক্ ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে গদীচ্যুত করলেন ও গভর্নরের শাসন শুরু হল।

জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা একজন জবরদস্ত সেনাপতি ও অত্যাচারী শাসক—তাঁকেই পাঠানো হল পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনকামী বাঙালীদের কঠোরভাবে শাসন করবার জন্য।

পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক্ করাচী থেকে যখন ঢাকা ফিরে যান তখন দমদম বিমানঘাঁটিতে তাঁর বিমান এক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়।

সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। হক্ সাহেব কিছু বলতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন—আমার কাছে এসে কোনও লাভ নেই। আমি কিছুই বলব না। আমার মুখ বন্ধ।

করাচী যে অন্যায় কৌশলে হক্ সাহেবকে গদীচ্যুত করার চেষ্টা করছিলেন তা সংবাদিকরা জানতেন। তাই তাঁরা আর কোনও প্রশ্ন করেননি।

বেলা দশটা এগার মিনিটে হক্ সাহেবের বিমান উঠল আকাশে, কোলকাতার মাটি ছেড়ে। তারপর আর কোনও দিনই তাঁর পা কোলকাতার মাটিতে পড়েনি।

এই সময়ও ফজলুল হকের সঙ্গে বিমান ঘাঁটিতে ছিলেন তরুণ কর্মীনেতা মুজিবর। হক্ সাহেব ও মুজিবরের সেদিনের সেই একাত্মতা বুঝি ব্যর্থ হয়নি। মুজিবর হলেন তাই পূর্ববাংলার বাঙালীদের গভীর মনোবেদনার, অকথ্য নির্যাতনের উত্তরে বিদ্রোহী হবার মূর্ত প্রতীক।

দেশে ফিরে হক্ সাহেব অন্তরীন হন। আজ হক্ সাহেব বেঁচে নেই, কিন্তু সারা বাংলাদেশে, পূর্বে, পশ্চিমে, তিনি আজও চির নমস্য। প্রতিটি বাঙালীর অন্তরে তিনি বিরাজমান। বাংলার মনোব্যথা তাঁর মুখেই প্রথম পেয়েছিল ভাষা। তিনি ছিলেন দুই বাংলার মধ্যে যেন এক মিলন-সেতু।

তুমি ছিলে, জাগ্রত বাঙালীর বিমূর্ত প্রতীক,
সর্বত্যাগী, খোলা প্রাণ, দুরন্ত, নির্ভীক—
ইস্পাত শানিত তলোয়ার,
তোমার ত্যাগের লাগি জেগেছে আজকে বুঝি—
বাংলার এ নব জোয়ার।
চির স্মরণীয় তুমি হে অজেয় বীর
তুমি ওগো চির ভাস্বর।
বেহেস্তের ওপার থেকে জানাই তোমায় আজ
আমাদের শ্রদ্ধা নমস্কার॥

দুর্যোগ এখানেই শেষ নয়।

আবার নেমে এল বিরাট এক দুঃখের কাহিনী—বেদনাদায়ক মর্মভেদী আর এক ইতিহাস।

সেনাপতি রাজ্যপাল ইস্কান্দার মির্জার কঠোর নিপীড়নে জেলখানায় বিপ্লবী সতীন সেন হলেন অর্ধমৃত—মৃত্যুপথযাত্রী।

জেলখানা থেকে তাঁকে তারা ছেড়ে দিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে। কিন্তু সে ছাড়া পাওয়া না পাওয়া সমান কথা। হাসপাতালে অচৈতন্য ছিলেন সতীন সেন। কয়েকঘণ্টা অক্সিজেনের নল নাকে নিয়ে শুয়ে থাকার পর তিনি প্রাণ হারালেন। দৈনিক কাগজে খবর বের হল :

হাসপাতালে সতীন সেনের মৃত্যু।

কিন্তু এ কি মৃত্যু, না হত্যা? অত্যাচারের চাপে তিলে তিলে প্রাণ দিতে হল বৃটিশ আমলের এই বিখ্যাত বিপ্লবীকে।

২৫শে মার্চ ১৯৫৫—রাত প্রায় দেড়টায় সতীন সেন মারা গেলেন।

দশটি মাস এই বৃদ্ধ বিপ্লবী জেলখানায় বন্দী থেকে তিল তিল করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে একত্রে সমবেত হয়েছিল তাঁর শ্রাদ্ধ বাসরে। জানিয়েছিল অশ্রুসিক্ত বেদনার অর্ঘ্য। কীর্তন গান হল—পাঠ হল গীতা—বাইবেল—কোরাণ।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলায় মুসলীম প্রগতিশীল নেতারা অবিরাম আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।

এই প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে করাচীর প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন আওয়ামী লীগের সুরাবর্দী। প্রেসিডেণ্ট হলেন ইস্কান্দার মীর্জা—পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্নর।

আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খাঁর মন্ত্রিসভায় মুজিবর রহমান ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। পিকিং-এ পাকিস্তান প্রতিনিধি-মণ্ডলীতে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। ফিরে এসে তিনি শুভেচ্ছা

সফরের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তিনি এক শিশি মধু উপহার দিয়েছিলেন।

১৯৫৪ সনের ৩০শে মে থেকে ১৯৫৮ সনের ৮ই অক্টোবর চলল আওয়ামী লীগের শাসন।

এই সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আমেজটা অগ্রগতির পথে এগোতে থাকে। এই সময় সর্ব প্রথম পাকিস্তানের জন্যে একটা পার্লামেণ্টারী ধরনের সংবিধান রচিত হয়।

পাকিস্তানকে যুদ্ধ-জোটের কবল থেকে মুক্ত করে একটা স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র,নীতির সম্পর্কে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আর তাদের পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদীরা হয়ে উঠলেন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত।

তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের মিলিটারীর প্রবীণ সেনাপতি আয়ুব খাঁ হঠাৎ একদিন ইস্কান্দার মীর্জাকে ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে জোর করে শাসনভার কেড়ে নিলেন।

ইস্কান্দার ভয়ে সামরিক শাসন জারী করলেন, তিনি পদত্যাগ করে চলে গেলেন পাকিস্তান থেকে চিরদিনের মত সুদূর ইউরোপে।

মার্কিন ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে পাকিস্তানের বুকে কায়েম হল মিলিটারী শাসন। জঙ্গীচক্রের ও সিন্ধু-পাঞ্জাবী চক্রের জবরদস্ত শাসন শুরু হল।

আয়ুব খাঁ হলেন প্রধান সামরিক শাসক। কেন্দ্রীয় আর প্রাদেশিক সরকার বাতিল হল। বেআইনী ঘোষিত হল সমস্ত রাজনৈতিক দল।

এই সময় ছাত্ররা কিছু কিছু বিক্ষোভ করলেও তা জোর করে দমন করা হয়।

মন্ত্রী সুরাবর্দী পালাবার চেষ্টা করলে তিনি ধৃত হলেন ও নিজ গৃহে হলেন অন্তরীন।

ইস্কান্দার মীর্জা পালিয়ে গেলেন সোজা ইংলণ্ডে। আজও তিনি

সেখানে আছেন। ভূতপূর্ব পাক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার আজ সামান্ত একজন হোটেলের ম্যানেজার।

আর নির্লজ্জ চক্রান্তকারী, ক্ষমতাদর্পী আয়ুব খাঁ হলেন, পাকিস্তানের ভাগ্য-বিধাতা।

৬

আয়ুব খানের সামরিক শাসন এত আকস্মিক ভাবে নেমে এল যে জনগণ প্রথমে হয়ে পড়ল হতচকিত, বিস্মিত।

১৯৫৮-এর অক্টোবর থেকে ১৯৬৯-এর মার্চ পর্যন্ত এই মোট এগারো বছর একটানা আয়ুব খাঁ নানাভাবে ছলে, বলে, কৌশলে সারা পূর্ব পাকিস্তানের উপরে অত্যাচারের স্টীম্ রোলার চালিয়ে গেছেন।

তাঁর অত্যাচার চলেছে নিত্য নতুন পথে।

প্রথমদিকে আয়ুব খাঁ এমন ভাব দেখালেন, যেন তিনি পাকিস্তানের নতুন এক দেবতা।

সর্বত্র মিলিটারী।

জোর করে লোককে কাজ করানো হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু ভাল কাজও করা হয়। ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাক মার্কেটিং বন্ধ করতে বলা হয়—ধরা পড়লে মিলিটারী শাসনে কঠোর শাস্তি।

পূর্ববাংলার পথে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্র শুধু মিলিটারীর টহল চলল।

সাধারণ পূর্বপাকিস্তানবাসী সেদিন ভয়ে একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারেননি।

আয়ুব খাঁ ঘোষণা করলেন : আমি সত্বর সব সমস্যার সমাধান করে দেব। লোকে সস্তায় খেতে পরতে পাবে—অভাব বলে কোম জিনিস থাকবে না পাকিস্তানে।

আয়ুব খাঁর নেতৃত্বে এই সামরিক শাসন কিন্তু পরে মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। দেখা গেল, কোনও সমস্যার সমাধান ত হয়ইনি—উল্টে তা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

সাধারণ মানুষ উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল।

পশ্চিমী শোষণ ও শাসন পুরো দমে চলতে লাগল।

গরীব পূর্ব পাকিস্তানের হল না কোনও উন্নতি।

চাষের উন্নতি নেই, খাদ্যের উন্নতি নেই, একটি সমস্যারও সমাধান নেই।

মাঝে মাঝে জনগণ ক্ষেপে ওঠে—বিদ্রোহী হয়।

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গী-চক্র আন্দোলনকে ধামা চাপা দিয়ে মানুষের মনকে অন্যদিকে বিভ্রান্ত করার জন্যে শুরু করে ভারত বিরোধী প্রচার কার্য আর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা।

এইভাবে এক এক দাঙ্গায় শত শত হিন্দু নিহত হয়—বাকিরা দলে দলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন ধামা চাপা পড়ে যায়। যখনই আন্দোলন চলে তখন শত শত বাঙালী নেতা ধরা পড়ে—জেলে যায়।

পূর্ববাংলার নেতাদের দাবী হল এভাবে চিরদিন জঙ্গীশাসন চলবে না। অবিলম্বে চাই গণতান্ত্রিক অধিকার—আর চাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।

দুটি দাবীই চলে সমান ভাবে।

দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হতে থাকে। সুরাবর্দী গ্রেপ্তার হন। এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ধর্মঘট করে। সুরাবর্দীর মুক্তি চাই—দমন নীতির অবসান চাই! দমননীতি বন্ধ করো।

সর্বত্র দেওয়ালে দেওয়ালে পড়তে থাকে পোস্টার।

একবার ঢাকা শহরেই বন্দী হল ২৫০ জন। অন্যান্য জায়গার গ্রেপ্তারের সংখ্যা হল আরও বেশি।

শুধু পূর্ব নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও জাগে তখন বিদ্রোহের ঢেউ। বন্দীদের মুক্তির দাবীতে শুরু হয় আন্দোলন। ভীত সরকার সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করেন।

১৯৬২-এর এই গণ-আন্দোলন হয়ে উঠল ক্রমে উদ্দাম—উত্তাল।

'এতো বিপ্লব কভু দেখে নাই কেউ।
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।'

আজ কেউ আর মিলিটারীকে ভয় পায় না। আজ অন্যায়, শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে মানুষ।

শুধু পূর্বে নয়—পশ্চিমেও।

আয়ুবশাহীর জঙ্গী অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও জেগে উঠেছিল সেদিন।

তারাও চাইছিল গণতন্ত্র—চাইছিল মিলিটারী শাসনের অবসান।

আয়ুবশাহী বিপদে পড়ে তখন নতুন এক প্যাঁচ কষলেন। তিনি স্বীকার করলেন মৌলিক গণতন্ত্র বা 'Basic democracy'।

সারা পাকিস্তাদের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম মানুষ হল এই মৌলিক গণতন্ত্রের ভোট দেবার অধিকারী।

যে-সব লোক ধনী, যারা আয়ুবশাহীর তাঁবেদার, যারা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে বহু সুযোগ-সুবিধা, কেবল তারাই ভোট দিতে পারবে।

এই নতুন গণতন্ত্র আবিষ্কার করে আয়ুবশাহী ডাকলেন নির্বাচন।

প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ালেন পরলোকগত জিন্নার বোন মিস্ ফতিমা জিন্না।

হল নির্বাচন। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ফতিমা জিন্নাকে স্বাগত জানাল। কিন্তু তারা নিরুপায়। তাদের ত আর কোনও ভোটাধিকার নেই।

নির্বাচনে আয়ুব খাঁ হলেন প্রেসিডেণ্ট। তাঁর প্ল্যান সফল হল। তিনি সমস্ত তাঁবেদার Basic Democrat-দের জানালেন অভিনন্দন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

আবার জেগে উঠল আন্দোলন, কিছু দিন পরেই। সাধারণ মানুষ জানল, এ নির্বাচন নির্বাচনই নয়—এটা শুধু নির্বাচনের প্রহসন মাত্র। সাধারণ মানুষ হল বিদ্রোহী।

আয়ুব প্রমাদ গুনলেন।

তিনি তখন ধরলেন তাঁর পুরোনো পথ। পূর্ব পাকিস্তানে আবার বাধালেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হাজার হাজার শান্ত, নিরীহ হিন্দু প্রাণ হারালেন।

এতেও কাজ হল না। তখন ভারতবিদ্বেষী জিগীর তুলে তিনি বাধালেন যুদ্ধ। তিনি প্রথমে কচ্ছের রাণ অঞ্চল আক্রমণ করেন। তারপর তিনি আক্রমণ করলেন কাশ্মীর। আয়ুব খাঁর এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে তাঁর দোসর ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি অবিরাম নানা সাম্প্রদায়িক ও ভারতবিরোধী জিগীর তুলে আয়ুব খাঁর দমন ও শোষণনীতিকে সাহায্য করে গেছেন। পশ্চিমীদের স্বার্থরক্ষায় করেছেন সহায়তা। তাই তিনি পশ্চিমীদের এত প্রিয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন ৺লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তিনি ঘোষণা করলেন যুদ্ধ। সে যুদ্ধে ভারতের নেতৃত্ব করলেন প্রধান সেনাপতি জে. এন. চৌধুরী। যুদ্ধে হল পশ্চিম পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়। অবশেষে ভারত তাসখন্দ চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের দখল

করা সব জমি ছেড়ে দিল। কিন্তু তবু ধূলায় লুটিয়ে পড়ল আয়ুবের জঙ্গী গর্ব।

*　　　*　　　*

সারা বাংলাদেশ জুড়ে আবার জাগল আন্দোলন। মৌলিক গণতন্ত্র নয়—পূর্ণ গণতন্ত্র চাই—চাই পূর্ণ জনগণের অধিকার। জঙ্গী শাসন আর লোকে সহ্য করতে রাজী নয়।

শুধুমাত্র দরিদ্র পূর্বাংলা নয়—তার সঙ্গে যোগ দিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, কাশ্মীরের পাকিস্তান অংশ ও বেলুচিস্তান।

আয়ুবশাহীর Basic নির্বাচনী ব্যবস্থার পরে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আটটি বিরোধী দল নিয়ে গঠিত হল এক সংগ্রামী পরিষদ।

এই পরিষদের দাবী হল—

(১) সংবাদ পত্রের বিধি নিষেধ, ১৪৪ ধারা, কালাকানুন, বিশ্ববিদ্যালয় অডিন্যান্স, রাজনৈতিক শাসন প্রভৃতি প্রত্যাহার করতে হবে ও বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

(২) নাগরিকদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

(৩) ধর্মঘটের অধিকার স্বীকার করতে হবে।

(৪) ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৫) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে।

(৬) সীমিত ও অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন চলবে না।

এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে ছিল মোট আটটি দল। তার মধ্যে পাঁচটি হল প্রতিক্রিয়াশীল দল।

(১) জেনারেল আজিম খাঁর দল।

(২) অবসর প্রাপ্ত বিমান অধিনায়ক আসগর খাঁর দল।

(৩) অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি মেহবুব্ মোর্শেদের দল।

(৪) নেজামে ইসলাম।

(৫) জামাইত ইসলাম।

আর সেই সঙ্গে ছিল তিনটি সংগ্রামী দল—যারা চেয়েছিল আরও বেশী অধিকার।

তারা হল—

(১) জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্‌স্ পার্টি।

(২) মৌলানা ভাসানীর নেশন্যাল আওয়ামী পার্টি।

(৩) শেখ জিবর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা দাবী-পন্থী আওয়ামী লীগ।

আয়ুব খাঁ সব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন।

তিনি পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকাবের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন মানলেন—কিন্তু ইউনিট ও স্বায়ত্তশাসন দাবী মানতে রাজী হলেন না। তিনটি সংগ্রামী দলই এতে হল ক্ষুব্ধ।

আয়ুব খাঁ প্রথমটা চালালেন অত্যাচার।

বহু ছাত্র, বহু অধ্যাপক, বহু তরুণ কর্মী নিহত হল তাঁর অত্যাচারে।

কিন্তু আয়ুব খাঁ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এই জোর জবরদস্তি শাসন চলবে না।

তাই তিনি কিছুটা কালক্ষেপ করে হঠাৎ একদিন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ইয়াহিয়া খাঁর উপরে শাসনভার অর্পণ করে আর পাকিস্তানে সামরিক শাসন ঘোষণা করে পদত্যাগ করলেন।

সেটা হল ১৯৬৯-এর ২৫শে মার্চ তারিখ।

সামরিক শাসনের ভার গ্রহণ করার ক'দিন পরেই ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন, তিনিই পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট।

আয়ুব খাঁ রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করে ত্রিশ মাইল দূরের সোয়াটো গ্রামে আশ্রয় নিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর

সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে—তাই তিনি সসম্মানে তাঁর কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিলেন।

এগারো বছর শাসন ও শোষণ করে তিনি তখন প্রভূত অর্থের

আর তাঁর শাসন করার প্রয়োজন কি ?

এখন যত ঝামেলা সব সাম্‌লে নিক্ ইয়াহিয়া। তার যেটুকু দাবী—যেটুকু লোভ ছিল, তার অনেক বেশি ত তিনি এগারো বছরে উপার্জন করেছেন।

আয়ুবের তখন উপার্জিত অর্থের যা পরিমাণ, তা তিন পুরুষ ধরে বসে খেলেও শেষ হবে না।

*　　　　*　　　　*

এবারে আয়ুবের শাসনকালে আওয়ামী লীগ আর মুজিবরের কি অবস্থা হয়েছিল তা বিবৃত করা হচ্ছে।

১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ ক্ষমতায় আসীন হতেই শেখ মুজিবর হন কারারুদ্ধ।

আটক অবস্থায় মুজিবরের বিরুদ্ধে পর পর ছয়টি বে-আইনী মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যেকটিতেই মুক্তি পান।

১৯৬০ সনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হল তাঁর গতিবিধি। গোয়েন্দা পুলিশ সব সময় তাঁর ওপরে দৃষ্টি রাখল।

১৯৬২ সনে নতুন সংবিধান চালু করার ঠিক আগে সুরাবর্দীকে গ্রেপ্তার করা হল। মুজিবরও এই সময় কারারুদ্ধ হলেন ও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করলেন।

সুরাবর্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সনের প্রথম ভাগে পাকিস্তানের দুটি অংশেই আওয়ামী লীগকে নতুন ভাবে সংগঠিত করা হল।

প্রেসিডেণ্ট পদে আয়ুবের বিরুদ্ধে মিস্ ফাতিমা জিন্নাকে সমর্থন করেন মুজিবর। তাই তিনি আয়ুবশাহীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পড়েছিলেন।

তারপর আয়ুবশাহী নতুন করে মুজিবরের ওপরে নির্যাতন চালাতে শুরু করেন।

১৯৬৫ সনে ভারত-পাক যুদ্ধের পরে মুজিবর তাসখন্দ ঘোষণাকে স্বাগত জানান। তিনি ছিলেন ঐ চুক্তির পটভূমিকায় পাক-ভারত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যে আগ্রহী।

১৯৬৬ সনে লাহোরের সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে মুজিবর তাঁর ছয় দফা কর্মসূচী পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। এই কর্মসূচীর মধ্যেই ছিল পাকিস্তানের পূর্ব অংশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবী।

এই দাবীর জন্যেই মুজিবর এবং আওয়ামী লীগ আয়ুবের বিষ-দৃষ্টিতে পড়েন।

আয়ুব খাঁ মুজিবরকে তাঁর স্বায়ত্তশাসনের দাবী ত্যাগ করার জন্যে অনেক ভয় দেখান, প্রলোভনও দেখান। কিন্তু মুজিবর অচল, অটল। তার ফলে তাঁর উপরে শুরু হল কঠোরতর নির্যাতন।

আবার মুজিবরকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু সেসন্স জজ তাঁকে জামিনে মুক্তি দিলেন।

তিনি বাড়ি পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁকে ধরা হল। এবারও জজ তাঁকে মুক্তি দিলেন।

তারপর আর একটা মামলা সাজিয়ে তাঁকে পাঠানো হল মৈমনসিংহ কোর্টে। সেখানকার সেসন্স জজ পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করলেন। শেষে মুজিবর মুক্তি পেলেন।

কিন্তু তিনি ঢাকায় ফিরে আসতেই আবার পুলিশ তাঁকে ধরল। এবারেও বিচারে মুজিবরের মুক্তির আদেশ হল।

কিন্তু জঙ্গী গভর্নর মোমেন খাঁ ঘোষণা করলেন, যতদিন তিনি গভর্নর থাকবেন ততদিন মুজিবরকে জেলে থাকতেই হবে। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হল বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

এই মামলায় বলা হল, শেখ মুজিবর রহমান আর তাঁর

দলবল পাকিস্তানের বিরোধী। তাঁরা ভারতের সঙ্গে চক্রান্ত করে পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা করতে চান।

এই সময় শেখ মুজিবর আর তাঁর দলের অনেকেই হলেন কারারুদ্ধ।

শুধু কারাগারে আবদ্ধ থাকাই নয়—সেই কারাগারে মুজিবর আর তার দলবলের ওপরে আয়ুবশাহী চালাল প্রচণ্ড নির্যাতন। শুধু নির্যাতন নয়—প্রচণ্ড দৈহিক কষ্টও তাঁদের দেওয়া হল কারাগারের মধ্যে।

কিন্তু সেই অকথ্য নির্যাতন নীরবে সহ্য করে প্রহর গুণতে লাগলেন মুজিবর আর তাঁর সহকর্মী বন্দীরা।

তাঁরা জানেন, এর কারণ কি। এর স্বরূপ কি। এই ত মানুষকে—সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধরণকে ভালবাসার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এ কষ্ট, এ নির্যাতন সহ্য করতে তাঁরা প্রস্তুত।

কিন্তু মামলা দায়ের করে এবারেও কোন সুফল হল না আয়ুবশাহীর।

মুজিবর ও তাঁর দলের সকলে সসম্মানে মুক্তি পেলেন।

মুক্তির পর মুজিবর যেদিন ফিরে এসে ঢাকার জনসমক্ষে বক্তৃতা দিলেন, সেদিন সে কি ভিড়! সে কি প্রচণ্ড উত্তেজনা!

দলে দলে মানুষ সেদিন এসে তাদের প্রিয় নেতাকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাল।

মুজিবর ঘোষণা করলেন :

আমি কোনও দিন পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে কোনও রকম ষড়যন্ত্র করিনি। আমি চেয়েছি স্বায়ত্তশাসন। আমি চেয়েছি সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার। আমি চেয়েছি শোষণ বন্ধ করতে। তাই আমার বিরুদ্ধে চলেছে একের পর এক চক্রান্ত।

সেদিন সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু

হয়েছিল, তা বন্ধ করার জন্যে আয়ুব খাঁ মুজিবরকে অনুরোধ করেন বেতার কেন্দ্র থেকে বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে শান্ত রাখার

মুজিবর সকলকে শান্ত হবার জন্যে ভাষণ দিলেন। আয়ুব খাঁর ঘটল চরম পরাজয়। তিনি দেখলেন আবহাওয়া প্রতিকূল।

তাই সুযোগ বুঝে তিনি মিলিটারী বিভাগের সর্বাধিনায়ক ইয়াহিয়া খাঁর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে নিজে চলে গেলেন রাজনীতির অন্তরালে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ এগারো বছর যে জঙ্গী আয়ুবশাহী পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করে আসছিলেন তার হল অবসান।

পাকিস্তানের গদীতে বসলেন নব-নিযুক্ত শাসক ইয়াহিয়া খাঁ।

পাকিস্তানের ইতিহাসে আবার শুরু হয়ে গেল নতুন এক অধ্যায়।

৭

নতুন জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া খাঁ ছিলেন আয়ুবের চেয়েও অনেক বেশী চতুর।

তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, আয়ুব খাঁ তার শাসন ও শোষণ ভাল ভাবে চালালেও শেষ পর্যন্ত কেন ব্যর্থ হলেন।

তিনি তাই কৌশলের মাধ্যমে মুসলীম লীগ-পন্থী পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও শাসন বজায় রেখে বেশ কিছুকাল বাদশাহী সুখভোগ কামনা করলেন।

তিনি জানেন মুখে মিষ্টি মধুর কথা না বললে তাঁর সব প্ল্যান ফাঁস হয়ে যাবে।

ইসলামাবাদের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি সংসার-বিবাগী, মাংস-লোভত্যাগী বৃদ্ধ বাঘের ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করলেন।

তিনি যেন মহৎ, সদাশয়। কোনও লোভ তাঁর নেই। তিনি চান সামরিক শাসনের ইতি করতে। তিনি চান প্রত্যক্ষ নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধি স্থির করতে।

তিনি তাই ঘোষণা করলেন:

"পাকিস্তানে সামরিক শাসনে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা হলে আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৭৩ সনেই আয়ুব খাঁয়ের প্রতিশ্রুতিমত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ নির্বাচন করিয়ে জাতীয় সভার হাতে সংবিধান প্রণয়ন এবং গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ভার আমি অর্পণ করব। পাকিস্তানে সামরিক শাসনের অবসান হবে।"

অপূর্ব মধুর কথা! কথাগুলো শুনে মনেই হয় না যে, তিনি পশ্চিমের আয়ুবগোষ্ঠীর বা জঙ্গীশাহীর একজন লোক।

আসলে এটা প্রকৃত কথা নয়—একটা মৌখিক ভাঁওতা মাত্র—যা আজ প্রমাণিত হয়েছে।

সামরিক শাসনের নির্যাতনে, নিপীড়নে বিদ্রোহী সীমান্তপ্রদেশ, অধিকৃত কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, আর পূর্ববাংলা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আয়ুব খাঁ তাই শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে একজন অবাঞ্ছিত লোক হয়ে উঠেছিলেন।

তাই সে-পথ তিনি অনুসরণ করলেন না। তিনি তাঁর কথায় মধু ঢাললেন।

কিন্তু ইয়াহিয়া আসলে আয়ুবের চেয়েও যে অনেক বেশি কুচক্রী তা আজ প্রমাণিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী কাজের মধ্য দিয়ে।

ইয়াহিয়া আয়ুবের নীতিই অনুসরণ করলেন—কিন্তু তিনি

নিজেকে সাজালেন শঠ প্রবঞ্চকের মত ছদ্ম বৈষ্ণব বেশে।

পাকিস্তানের সংকটত্রাণ আর ভারতের হাতে পাকিস্তানের বিপদের ভয় দেখিয়ে—পাকিস্তানের ঐক্য আর সংহতির জিগীর তুলে তিনি পাকিস্তানী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের হাত করার চেষ্টা করলেন।

ইয়াহিয়ার চালচলন দেখে রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা বুঝতে পারলেন, তিনি নেতাদের মতের অনৈক্যেব ধুয়া তুলে সংবিধান রচনা আর সরকার গঠন বন্ধ রাখবেন। তিনি জানতেন সারা পাকিস্তানে আছে নানা পার্টি, কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবে না। তাই নির্বাচন করলেও তিনি ব্যর্থ হবেন না।

তিনি বললেন শেষ পর্যন্ত—কার হাতে ক্ষমতা দেবো ?

এই কথা বলে, তিনি কৌশলে সামরিক শাসনই বলবৎ রাখতে চেয়েছিলেন।

সংবিধান প্রণয়ন আর সরকার গঠন সম্পর্কে ইয়াহিয়া যে নির্দেশ দিলেন তা খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যক।

ইয়াহিয়া নির্দেশ দিলেন :

(১) পাকিস্তান হবে ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র।

(২) পাকিস্তান হবে অধিকতর স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশসহ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের যুক্তরাষ্ট্র।

(৩) নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ যদি ১২০ দিনের মধ্যে (৪ মাস) সংবিধান রচনা করতে না পারে, তা হলে এই জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

(৪) খসড়া সংবিধান প্রেসিডেণ্টের সম্মতি ছাড়া কখনো গ্রাহ্য হবে না।

(৫) জাতীয় পরিষদ সাধারণ কাঠামোর এই নির্দেশকে বাতিল করতে পারবে না।

(৬) জাতীয় পরিষদ এবং রাজ্য পরিষদ কেউই প্রেসিডেণ্টের আদেশ ছাড়া কাজ করতে পারবে না।

এই আদেশ খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, জাতীয় পরিষদ আর রাজ্য পরিষদ, সর্বত্রই প্রেসিডেন্টই হলেন একেবারে সর্বেসর্বা।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার গঠন আর সংবিধান রচনা করার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে প্রেসিডেণ্টের তা ভাঙবার ও বানচাল করার ক্ষমতাও আছে।

এর কারণ হল, সুযোগ বুঝে যে কোন মুহূর্তে সামরিক শাসন প্রবর্তন করার অধিকার তিনি হাতে রাখলেন।

ইয়াহিয়ার নির্দেশের প্রথম অনুচ্ছেদের 'ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্র' কথাটিও ধোঁয়াটে। তিনি এতে ঠিক কি ধরণের রাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করেছেন তা বোঝা যায় না।

১৯৫৬ সনে প্রথম সংবিধান রচনার সময় থেকেই পাকিস্তানীরা ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্রের কথা বলে আসছিলেন। তখন সংবিধানে বলা হয়েছিল, পাকিস্তান হলো ঐস্লামিক রিপাবলিক। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ইস্লামের বিধানকে অনুসরণ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ইসলামের বিধানবহির্ভূত কোনও আইন পাশ করা হবে না।

আয়ুব খাঁর শাসনকালে তিনি ১৯৬২ সনে যে দ্বিতীয় সংবিধান রচনা করেন তখন ঐ কথা দুটি তিনি কেটে বাদ দেন। তবে তিনি এই সংবিধানে লেখেন যে, মুসলিম ছাড়া আর কেউ পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হতে পারবেন না।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা ইস্লামভিত্তিক সংবিধান পছন্দ করে। তাই ভুট্টোকে নির্বাচিত করার পেছনেও তাদের এই মনোবৃত্তি কাজ করেছে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু মুসলমান যে সকলেই সমান নিপীড়িত হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ববাংলার হিন্দু মুসলমান। তাই

ধর্মের উপরে জোর না দিয়ে তাঁরা ভাষা ও সংস্কৃতির উপরে জোর দিয়েছিলেন। ধর্ম তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপার—পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বই প্রধান। তা ছাড়া নিপীড়িত পূর্ববাংলার কাছে প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। ধর্মের নামে ভাঁওতা দিয়ে পশ্চিমীরা যে কত অত্যাচার চালিয়েছে তা পূর্ববাংলার মানুষ হাড়ে হাড়ে বোঝেন।

ভুট্টো একদিকে ইসলামের দোহাই দিয়ে পশ্চিমীদের হাত করার চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র কথাটা বলে চীনকে খুশী করেছিল। ভুট্টোর থিয়োরী ছিল ঐশ্লামিক সমাজতন্ত্র। তাই পিপল্স্ পার্টি পশ্চিমে আর মুজিবর রহমান পূর্বে সফলতা অর্জন করেছিলেন।

তাছাড়া ভুট্টো সব সময় পশ্চিমীদের মন যোগাতে কড়া কড়া ভারতবিরোধী বুলি আওড়াতেন—যা তাদের খুব আকৃষ্ট করত।

ইয়াহিয়া খানও তাই সংবিধানের গোড়াতে ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্র কথাটা জুড়ে বিভিন্ন পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতেই চেয়েছিলেন—যা পূর্ববাংলার নির্বাচনে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম লীগও পূর্ববাংলায় স্থান পায়নি।

* * *

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অংশ ভারতের দুটি প্রান্তে অবস্থিত—মাঝখানে দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান। এইভাবে শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে এক রাষ্ট্রের শোষণ ও অন্যটির শোষিত হবার ব্যবস্থা চিরদিন চলতে পারে না—এ কথা সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা স্বীকার করেছিলেন।

তাঁরা বলেছিলেন যে, কেন্দ্রকে অন্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে হবে—মন্ত্রিসভাকে সম্ভব হলে ভেঙ্গে দুই রাষ্ট্রের হাতে দিতে হবে—সামরিক ও পররাষ্ট্র রাখতে হবে কেন্দ্রের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের আয় দুই রাষ্ট্রকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু পশ্চিমীরা—বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা পাকিস্তান সৃষ্টির পর

থেকেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে আছেন—তাঁরা তা আজীবন থাকতে চাইছিলেন।

দরিদ্র কৃষিপ্রধান পূর্বাংলার ওপরে প্রভুত্ব বজায় রাখা ও অর্থনৈতিক শোষণ তাদের মূল উদ্দেশ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানের ত বটেই, পূর্ববাংলার শিল্প-বাণিজ্যও পশ্চিমীদের হাতে। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের সম্বল সরকারী আর সওদাগরী অফিসে চাকরী। তাদের শতকরা ৯০ ভাগের বেশী কৃষিজীবী। মাঠের নানা ফসল আর পুকুর-নদীর মাছ তাঁদের সম্বল।

পূর্ববাংলায় পাট প্রচুর জন্মায়—কিন্তু তার সব লভ্যাংশ যায় অবাঙালী পাঞ্জাবী মুসলমানদের ঘরে। তাই প্রাকৃতিক সমৃদ্ধিতে পূর্ণ পূর্ববাংলার মানুষদের মুখের অন্ন কাড়তে না পারলে, তাদের অনাহারে রাখতে না পারলে পশ্চিমীদের নবাবিয়ানা চলবে কি করে?

পূর্বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই হয়নি। পূর্ববাংলার চাষী আজও সেই মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতে চাষ করে। ট্রাক্টার তাদের কাছে প্রায় স্বপ্ন।

পূর্ববাংলার অসহায় বাঙালী কৃষক ঝড় তুফানের মাঝে, বন্যার তাণ্ডবের মাঝে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে শুনছে সামরিক শাসনের কড়া হুমকি আর দেখছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থের জৌলুস। ধর্ম আর ভারতবিরোধিতার কৃত্রিম বুলি আউড়ে তাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

তাই চিরদিন পশ্চিমীদের নির্বাচনে অনিচ্ছা। তারা চায় জবরদস্তি।

তাই পূর্ববাংলার দরদী জনপ্রতিনিধি মুজিবর আয়ুবের কারাগার থেকে শুরু করে তার পরেও বলেছেন একটা কথা—পশ্চিমীরা পূর্ববাংলা থেকে হাত গোটাও।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ভুট্টোর একমাত্র মূলমন্ত্র হল ভারত-বিরোধিতার বুলি বলা। তা পশ্চিমীদের আকৃষ্ট করলেও পূর্ব-বাংলাকে আর পারে না।

মুজিবর আর তাঁর দল ধীর স্থির ও সংকল্পে অটল। তাঁরা উগ্রপন্থী নন। তাঁরা পূর্ববাংলার মনোবেদনাকে দিয়েছেন বাঙ্ময় রূপ। তাঁরা চান পূর্ববাংলার স্বাধিকার, স্বাধীনতা।

মুজিবরের ডাক তাই পূর্ববাংলাবাসীকে যেমন আকৃষ্ট করেছে তেমনি তা পশ্চিমীদের করেছে সতর্ক, ভীত।

মৌলানা ভাসানীও জাতীয়তাবাদী নেতা। তবে তিনি চীন-পন্থী। চীনের মত তিনিও চেয়েছিলেন কৃষিবিপ্লব। কিন্তু বাঙালীর ন্যায্য দাবী তিনি চিরদিন স্বীকার করে এসেছেন। তাই আজ ভাসানীর সঙ্গে মুজিবরের কোনও বিরোধ নেই।

নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবর তাঁর যে ছয় দফা দাবী ঘোষণা করলেন, তা সর্বসাধারণের মনের কথা। মুজিবরের ছয় দফা দাবী হল :

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দুটি বিষয়—পররাষ্ট্র আর প্রতিরক্ষা। অন্য সব বিষয় যাবে প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলির হাতে।

২। লাহোরের প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র, প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদীয় সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে।

৩। রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষায় আধা সামরিক ও রাষ্ট্র-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিবিধান ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার সংবিধানসম্মতভাবে থাকবে রাজ্যগুলির আয়ত্তাধীন।

৪। রাজ্যগুলির জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণের অধিকার থাকবে।

৫। (ক) বিনিময়যোগ্য দুটি ভিন্ন মুদ্রার প্রচলন অথবা সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি মুদ্রার প্রচলন।

(খ) পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে।

(গ) রাজ্যের থাকবে কর ও ডিউটি নির্ধারণের অধিকার, কেন্দ্রের এ অধিকার থাকবে না। সরকারের ব্যয়ভার বহনের জন্য আদায় করা অর্থের একটি অংশ কেন্দ্র পাবে।

(ঘ) রাজ্যগুলির মধ্যে করের সমতাবিধান করার জন্যে থাকবে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল।

৬। (ক) বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে রাজ্যের অর্জিত অর্থের থাকবে পৃথক হিসাব। রাজ্যের হাতে থাকবে সে-ভার।

(খ) কেন্দ্রের বৈদেশিক খরচা সমতার বিধানে বা নির্দিষ্ট বিধানে বহন করবে রাজ্য।

(গ) অন্তর্দেশীয় পণ্য কর ইত্যাদি ছাড়াই দুই রাজ্যের মধ্যে চলাচল করা চলবে।

মোট কথা, মুজিবরের ছয় দফা দাবীর মূল কথাই হল, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও শোষণ বন্ধ করা। কেন্দ্রের হাতে শুধু থাকবে নির্দিষ্ট আর্থিক সাহায্য, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা।

এই ছয় দফা দাবীর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা প্রচলনে ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার প্রবল আপত্তি। তাঁদের ধারণা এতে পাকিস্তানের ঐক্য নষ্ট হবে—এমন কি স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে। কিন্তু মুজিবর সব ক'টি দাবীতে অটল।

* * *

মুজিবরের ছয় দফা দাবী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল মহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

এইসব মহল থেকে ইয়াহিয়া খাঁর কাছে দাবী উঠল, আয়ুব খাঁ যে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন, তা আবার চালু করা হোক—বন্দী করা হোক

মুজিবরকে। মুজিবর হলেন নাকি পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি ও স্বাধীনতার প্রধান শত্রু।

পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আয়ুববিরোধী আব্দুল কাইয়ুম খাঁ বলেন, ছয় দফা সূচী সংবলিত স্বয়ংশাসিত পূর্ববাংলার পরিকল্পনা হল আয়ুব খাঁর। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর অনুমোদন পেয়ে তা রচিত হয়।

পরে বিস্তৃত ব্যাপার নিয়ে মুজিবরের সঙ্গে আয়ুবের মতবিরোধ হয় বলেই আয়ুব তাঁর বাঙালী বন্ধুকে একটা শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

কোনও কোনও মহল একথা স্বীকার করে আরও বলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আয়ুব প্রেসিডেন্ট থাকবেন ও মুজিবর প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই আলোচনা হয়—তাই আয়ুব মুজিবরকে মুক্তি দেন ও মামলা প্রত্যাহার করেন।

নবাবজাদা নফরুল্লা খান বলেন: মুজিবর রহমানের এই কাজ জাতীয়তাবিরোধী। এটাকেই সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে নিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আবার শুরু করা যেতে পারে।

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী এস্, এস্, জাফর বলেন: আসলে মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। মুজিবরকে গোলটেবিলে বসবার সুযোগ দেবার জন্যেই আয়ুব অর্ডিন্যান্স করে মামলাটি মুলতুবি রাখেন। তাই সেটা আবার চালু করা উচিত।

কিন্তু মুজিবর আর তাঁর সঙ্গীরা বলেন: এটা হতাশ পশ্চিম পাকিস্তানের খেদোক্তি মাত্র। এরা চায় না যে, নির্বাচন হোক বা বাঙালীরা কোনও ক্ষমতা পাক।

৮

ইয়াহিয়া খাঁ স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠন ও নতুন সংবিধান রচনার জন্ম নির্বাচন আহ্বান করলেন।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আটজন নেতার মধ্যে ছয় জনই তখন ইয়াহিয়া খাঁর সহযোগী। বাকি কেবল মৌলানা ভাসানী আর শেখ মুজিবর।

মুজিবর জাতীয়তাবাদী—ভাসানী চীনপন্থী। কিন্তু অন্য সব দিকেই এঁদের মধ্যে মিল আছে।

দুই পাকিস্তানেই নানা পার্টি। পাকিস্তান নির্বাচনে জাতীয় সভা বা নোশন্যাল এ্যাসেম্বলী আর প্রাদেশিক সভা বা Provincial Assembly দুটিতেই নির্বাচন হবে। জাতীয় সভায় বাংলাদেশের সদস্যসংখ্যা ১৬২—তার মধ্যে ১৫৩টি আসনে নির্বাচন হয়েছে—৯টি ঝড়-ঝঞ্ঝার জন্যে বাকি আছে।

পূর্ব পাকিস্তানেও প্রাদেশিক সভার সভ্যের সংখ্যা হল ৩০০। তার মধ্যে ২৯১টিতে নির্বাচন হয়ে গেছে, বাকি ৯টিতে হয়নি। এই সব আসনে মোট ১৪।১৫টি পার্টি তাদের প্রার্থী দিয়েছিল। কি রকম প্রার্থী ছিল তা দেখানো হচ্ছে।

পূর্ববাংলার মোট ১৫৩টি জাতীয় সভার আসনে কে কত প্রার্থী দিয়েছিলো তা দেখা যাক :

১। আওয়ামী লীগ	...	১৬২
২। মুসলিম লীগ	...	১৬২
৩। জামাতে ইস্‌লাম	...	৬৬

৪।	পাক মুসলীম লীগ (কোয়াউস্ পন্থী)		৬২
৫।	পাক ডেমোক্রেটিক পার্টি	...	১০০
৬।	নিজামে ইসলাম	...	৫৫
৭।	কাউন্সিল মুসলীম লীগ	...	৫৫
৮।	ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি খাঁর দল)		৪০
৯।	পাক ন্যাশন্যাল লীগ	...	২০
১০।	ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানীর দল)		২০
১১।	ইসলামী ইউনাইটেড ফ্রণ্ট	...	২৩
১২।	কৃষক শ্রমিক পার্টি	...	১১
১৩।	ন্যাশন্যাল ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট	...	৮
১৪।	পাক ন্যাশন্যাল কংগ্রেস	...	৪
১৫।	ডেমোক্রেটিক ফ্রীডম পার্টি	...	৩

এই মোট আসনে যে ১৫৩টি কেন্দ্রে নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগ ১৫১টি আসনেই জয়লাভ করেছেন।

প্রাদেশিক সভায় ৩০০টি আসনে যে যে পার্টি প্রার্থী দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—

১।	আওয়ামী লীগ	...	৩০০
২।	কনভেনশন মুসলীম লীগ	...	৩০০
৩।	জমাতে ইসলাম	...	১৪৯
৪।	পাক ডেমোক্রেটিক পার্টি	...	১৭৭
৫।	কাউন্সিল মুসলীম লীগ	...	১৪৯
৬।	নিজামে ইসলাম	...	১১৩
৭।	ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি গ্রুপ)		৬৫
৮।	ইসলামী ইউনাইটেড ফ্রণ্ট	...	৩২
৯।	কৃষক শ্রমিক পার্টি	...	১৪
১০।	পাক ন্যাশন্যাল কংগ্রেস	...	৪২
১১।	পাক ন্যাশন্যাল লীগ	...	৩

পাকিস্তানের ঝটিকাপূর্ণ সংবিধানিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোট এবং পাঁচটি প্রদেশের ইউনিট করে লোকসংখ্যা হিসাবে প্রকৃত নির্বাচন হল। প্রাদেশিক সভায় ৩০০টি আসনের মধ্যে মুজিবর ২৬২টি আসন লাভ করেছেন। ৯টি কেন্দ্রে এখনো নির্বাচন হয়নি।

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫৫ জন হল বাঙালী। তাই সারা পাকিস্তানে মুজিবরের দল হল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। জাতীয় পরিষদে মুজিবর পেয়েছেন ১৫৩৫ আসন—যেখানে ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি পাঞ্জাব সিন্ধু প্রভৃতি স্থান থেকে মোট ৮২টি আসন লাভ করে পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের পার্টিরা পেয়েছে আরও কম স্থান।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যদি বানচাল করে দেবার চেষ্টা না হয় তাহলে মুজিবরের প্রাপ্য হল সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ। মুজিবরের একটি পার্টিই যে এত আসন দখল করতে পারবে তা ইয়াহিয়া বা ভুট্টো ভাবতেও পারেননি।

একথাটা ইয়াহিয়া দু একবার মুখে স্বীকার করেছেন—সেটা পরিহাস কিনা কে জানে! ভুট্টো একথা একবারও বলেননি।

মুজিবরের জয়জয়কারে এবং ভুট্টোর দ্বিতীয় স্থান অধিকারে দুই মতবাদ সম্পন্ন দুটি দল ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়াল—রাজনৈতিক সংঘর্ষের সামনে এসে দাঁড়াল পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান।

আওয়ামী লীগ ও পিপল্‌স্ পার্টি ব্যাঙ্ক, বীমা ও শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যাপারে একমত—কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, মুদ্রা তৈরী, বৈদেশিক বাণিজ্য এসব ব্যাপারে দুই দলের দুই মত। ভুট্টো বলেন, এসব জাতীয়তা বিরোধী কাজ।

তাছাড়া নিয়ম অনুযায়ী মুজিবর হলেন প্রধানমন্ত্রী—ভুট্টো

হলেন বিরোধী নেতা। কিন্তু ভুট্টো তাতে রাজী নন। তিনি চান পশ্চিমের মন্ত্রিত্ব।

দুই নেতাই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বানের প্রতীক্ষা করেন। দুজনেই পৃথক পৃথক খসড়ার সংবিধান রচনা করেন।

দুই নেতার দুই ভিন্ন মত পাকিস্তানের সংবিধান রচনা ও সরকার গঠনে এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করল।

তাছাড়া মুজিবর চান ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব—এমন কি বাণিজ্যিক লেনদেন। ভুট্টো চূড়ান্ত ভারত বিদ্বেষী।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকা এ সময় রীতিমত রহস্যময় হয়ে উঠল।

তিনি এক মুখে ঢাকায় এসে শেখ মুজিবরকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী রূপে অভিহিত করেন—অন্য মুখে তিনিই আবার ভুট্টো-মুজিবরের সমঝোতা ও বোঝাপড়ার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন।

পাকিস্তান এগিয়ে চলল এক জটিল সমস্যার পথে।

* * *

ছয় দফা দাবী ছাড়াও মুজিবর দেশের জন্য যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তা হল ঃ

(১) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য তার অবসান।

(২) ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

(৩) পাট-ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা জাতীয়করণ।

(৪) ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব।

(৫) লবণ কর প্রত্যাহার ও তামাক, আখের কর হ্রাস।

(৬) কৃষক ও শ্রমিকদের সুখ সুবিধার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) দ্রব্যমূল্য যতটা সম্ভব কমাবার চেষ্টা করা।

কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে কায়েমি স্বার্থের বাধা প্রবল। সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিরোধীশক্তি সামরিক ও পাঞ্জাবী-প্রধান আমলাতান্ত্রিক চক্রের সাহায্যপুষ্ট হলেন ইয়াহিয়া খাঁ। তিনি অত সহজে সব ছেড়েছুড়ে দিতে রাজী হবেন কেন?

তিনি তখন চাললেন এক নতুন কৌশল। তিনি ঢাকায় গিয়ে মুজিবরের তোয়াজ করেন আবার করাচীতে গিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বানচাল করার জন্যে সলা-পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করেন।

কিন্তু ভুট্টো একা পশ্চিমাদের প্রতিনিধি নন। একমাত্র সিন্ধু ও পাঞ্জাব ছাড়া অন্য প্রদেশগুলিতে তাঁর দল একেবারেই প্রবল নয়। আর মুজিব সারা পূর্ববাংলার জনগণের সম্রাট।

তবু ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর বন্ধ রাখার চক্রান্তে ভুট্টোকেই করলেন প্রধান অস্ত্র।

ইয়াহিয়া শুধু বলেন—আপনারা দুই নেতার মধ্যে একটা সমঝোতা করে নিন—তা না হলে আমি কি করে হস্তান্তর করি?

আবার তিনিই ভুট্টো ও মুজিবরের মধ্যে বিবাদকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলেন। তাঁর উদ্দেশ্য এইভাবে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি আবার চালাবেন সামরিক শাসন।

ভুট্টো চিরদিন কড়া মেজাজের লোক। ভারতকে কড়া কড়া গালাগালি করেন বলেই তিনি পশ্চিমীদের প্রিয়।

ভুট্টোর সমালোচনা ওদেশের কোন পত্রিকায় বের হলে তিনি তাদের একহাত দেখে নেবেন বলে হুমকি দেন।

ক্ষমতামদে ভুট্টোর মত্ততা অসম্ভব। তিনি ত মুজিবরের প্রতি প্রায় হুমকি দিলেন। বাংলার জনগণের সঙ্গত ক্ষোভ মানার বদলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

মুজিবরের বিরুদ্ধে তাঁর বিভিন্ন উক্তি ঠিক ফ্যাসিষ্ট নেতার উক্তি বলে মনে হয়।

পাকিস্তান টাইম্স্, লাহোরের দৈনিক খিদাইমিল্লাহ, দৈনিক কোহিস্তান এবং ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকা তীব্রভাবে ভুট্টোকে সমালোচনা করেছেন এ সময়।

ভুট্টোর দলও আবার তেমনি। তারাও সকলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করল। মুজিবর যেমন পূর্ববাংলার সর্বজনমান্য নায়ক, ভুট্টোর ইচ্ছা তিনিও হবেন তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের মুখপাত্র। তাঁকে এ বিষয়ে পশ্চিমী ভারত-বিরোধী মুসলমানরা উস্কানি দেন।

দুই নেতার এই মতানৈক্যের সুযোগে এদিকে ইয়াহিয়া খুঁজেছেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বানচালের পথ। নিজের মসনদ কায়েম রাখার চেষ্টা করেন তিনি।

* * *

ইয়াহিয়া খাঁ ৩রা মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করলেন।

জাতীয় সভার উদ্বোধন করবেন প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া। তাতে পৌরোহিত্য করবেন পাকিস্তানের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার আবদুস সাত্তার। এর মধ্যেই তিনি ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় রওনা হয়েছেন। স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুস্তাক আমেদ।

তিনি ঘোষণা করলেন :

৩০শে জুন, ১৯৭১-এর মধ্যে নতুন সংবিধান রচনার কাজ শেষ করতে হবে। ইয়াহিয়া খাঁর অসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল হবে। তবে ইয়াহিয়া খাঁ প্রেসিডেণ্ট থাকবেন।

এদিকে ভুট্টো ছাড়া অন্যান্য সব দল জাতীয় সভার ৩রা মার্চের ঢাকা অধিবেশনে যোগ দিতে রাজী হলেন। এই সব দলের কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধি এলেন ঢাকায়। ভুট্টোর পিপল্স্ পার্টির কিছু সদস্য ঢাকায় যাত্রা করলেন।

ভুট্টোর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যেতে থাকে।

এমন কি তাঁর নিজের প্রদেশের পত্রিকা করাচীর ডন লিখলো, ভুট্টোর নীতি অগণতান্ত্রিক ও পাকিস্তানের মঙ্গল এতে হবে না।

সিন্ধুর একজন নেতা জনাব জি. এম্. সৈয়দ বললেন—ভুট্টো ফ্যাসিস্টবাদী।

ভুট্টো দাবী তুললেন—কেন্দ্রভিত্তিক সংবিধান চাই। সব প্রদেশের অনুমোদন না হলে সংবিধান রচিত হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে আওয়ামী লীগের মতামত জাতীয় সভাকে চালনা করবে! কিন্তু অগণতান্ত্রিক ভুট্টো তা মানতে চান না।

মুজিবর বললেন—পাকিস্তানে আধিপত্য করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি চাই আমার বাংলার সব সমস্যার সমাধান।

ভুট্টো তখন অধিবেশন বয়কট করলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের ঢাকা ত্যাগ করে চলে আসতে নির্দেশ দিলেন।

তিনি বললেন—যারা নির্দেশ অমান্য করে ঢাকায় থাকবে তারা তা নিজ দায়িত্বে থাকবে—তিনি এ ব্যাপারে দায়ী নন।

এদিকে মুজিবর ইয়াহিয়াকে জানালেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তাঁর সঙ্গে একমত না হলে এবং ঐসলামিক প্রজাতন্ত্র সংবিধানে স্বীকৃত না হলে তিনি অধিবেশন বর্জন করবেন এবং ব্যাপক হরতালের ডাক দেবেন।

ইয়াহিয়াও তাই চান। যতো দু'পক্ষে মতভেদ হবে—ততই জঙ্গীশাসন বজায় রাখার সুবিধা।

তিনি তখন ছুটে গেলেন ভুট্টোর কাছে—রুদ্ধ কক্ষে বসে সেদিন দুই চক্রান্তকারীর মধ্যে কি কথাবার্তা হল তা অন্য কেউ জানতেও পারল না।

ইয়াহিয়ার ঘোষণা মত জাতীয় সভার অধিবেশন বসতে তখন আর মাত্র আটদিন দেরী।

দুজনের কথাবার্তা কি হল তা না জানা গেলেও বোঝা গেল যে ভুট্টোর হুম্‌কির কাছে ইয়াহিয়া নতি স্বীকার করলেন।

৯

১লা মার্চ, ১৯৭১।

সেদিন হঠাৎ ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন: ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় সভার যে অধিবেশন বসার কথা ছিল তা মুলতুবি রাখা হল।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই মুলতুবি রাখার কারণ হল— পাকিস্তানের দুই অংশের দুই নেতার মধ্যে রাজনৈতিক মত-বিরোধ শুরু হয়েছে।

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল নবজাগ্রত পূর্ববাংলা।

ধীর, স্থির, অচল, অটল মুজিবর ক্ষুব্ধ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন: সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন।

প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগল পূর্ববাংলার বুকে। জনগণের বিক্ষোভের সঙ্গত কারণও অবশ্য ছিল। কি কি কারণে এই ক্ষোভ ও বিক্ষোভ তা বলা হচ্ছে।

১। ভুট্টোর দাবীতে জাতীয় সভার অধিবেশন মুলতুবি

রাখলেন ইয়াহিয়া খাঁ—অথচ মেজরিটি ভোট-প্রাপ্ত মুজিবরের সঙ্গে তিনি একবার আলোচনাও করলেন না।

২। অধিবেশন হলে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিলেন ভুট্টো, পূর্ববাংলার বাঙালীরাও যে হরতাল করতে পারে তা তিনি ভাবেননি বা তা গ্রাহ্যও করেননি।

৩। জাতীয় সভা স্থগিত রাখার যুক্তি হিসাবে ইয়াহিয়া বলেছেন, 'হকি' ও 'হিজাকিং' নিয়ে ভারত উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা বলেন ও সব অবাস্তর কথা 'হিজাকিং'-এর ব্যাপারে পাক-সরকারই দায়ী। তা ছাড়া ভারত অযাচিতভাবে ঝড়ঝঞ্ঝায় দুর্গত পূর্ববাংলার লোকদের জন্যে প্রচুর ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছেন। এসব ভারত-বিদ্বেষ সৃষ্টির অপকৌশল চলবে না।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানীদের দীর্ঘদিনের বিদ্বেষ ও উপেক্ষা—তাদের অন্যায় জুলুম ও শোষণ বাঙালীদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

৫। পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার তাদের দেশের লোকদের যে চোখে দেখেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের সে চোখে মোটেই দেখেন না। তাদের বিন্দুমাত্র উন্নতি তাঁরা চান না।

৬। মুজিবরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলে অভিহিত করার জন্যে ইয়াহিয়া পূর্বতন গভর্ণরকে পদচ্যুত করেন। তার পরিবর্তে সামরিক প্রশাসক টিক্কা খাঁকে নিয়োগ করেন।

৭। কোনও দিনই গণতন্ত্র ও কোনও সুবিধা পূর্ববঙ্গবাসীরা পায় তা চান না পশ্চিমীরা, এটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল।

*　　*　　*

বিক্ষুব্ধ বাঙালীর রোষ তখন গিয়ে পড়ল অবাঙালীদের ওপরে।

অবাঙালীদের দোকান-পাট, কল-কারখানা, বাড়িঘর লুট

করতে লাগল বিক্ষুব্ধ বাঙালীরা। শুরু হল প্রচণ্ড একটা মনোমালিন্য।

এজন্যে প্রস্তুত ছিল ইয়াহিয়া খাঁ।

ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি এসে পড়তে লাগল নিরীহ মানুষদের ওপরে। অগুণতি গুলির প্রবাহ বহে চলল যেন।

তবু মানুষ ভয় পায় না। ১লা মার্চ বন্দী মানুষেরা ঢাকার জেল ভাঙল।

গুলি চলে—তবু বেপরোয়া মানুষ বিক্ষোভ দেখায়—ক্রোধে ফেটে পড়ে, মিছিলে জড়ো হয়।

সেদিন পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, কর্ণফুলি আর বুড়িগঙ্গার কূলে কূলে সব মাটি বুঝি লাল রঙের বন্যায় পিছিল হয়ে যায়।

সারা পূর্ববাংলায় মোট তিন হাজার মানুষ সেদিন গুলিতে প্রাণ দেয়। কারও কারও ধারণায় তা আরও বেশি—প্রায় দশ হাজার।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নেতাদের কণ্ঠে জাগল প্রচণ্ড ধিক্কার। মৌলানা ভাসানী আগে ছিলেন বামপন্থী দলে—তিনি এবারে মুজিবরকে সমর্থন জানালেন।

তবু নীরব ভুট্টো। তার মানে এই যে, সেই ত এই হত্যাকাণ্ডের মূলে—তাই নীরব তাকে ত হতেই হবে।

আওয়ামী লীগ দাবী করল—অবিলম্বে সৈন্য সরাও।

১লা থেকে ৪ঠা মার্চ চারদিন গুলি চালিয়ে ৪ঠা মার্চ বিকেলে ব্যারাকে ফিরে গেল ইয়াহিয়া খাঁর সৈন্যদল।

ইয়াহিয়া খাঁ যে ভুট্টোর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, তা এবার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই তাদের এই প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

৩রা মার্চ তারিখে মুজিবর ডাক দিলেন—সারা বাংলা জুড়ে হরতালের ডাক।

সে ডাকে সাড়া দিল সারা পূর্ববাংলা। দোকান খুলল না। কলকারখানা, বাজার হাট সব হল বন্ধ।

মুজিবর জানতেন না, সাধারণ মানুষের ওপরে আরও অত্যাচার হবে।

হরতালের সঙ্গে সঙ্গে চলল মিছিল।

মিছিলের ওপর আক্রমণ চালাল হিংসায় অন্ধ জঙ্গীশাসকরা।

কিন্তু বাঙালী জনতা অচল, অটল।

তাদের কথা—কামানের মুখেও আমাদের ছয় দফা দাবীকে ছাড়ব না।

এদিকে ভুট্টো তখন পশ্চিমীদের বোঝাচ্ছেন—মুজিবর আমাদের 'এনিমি কান্ট্রি' ভারতের দালাল। তাকে কোন মতেই সমর্থন করা চলে না।

পশ্চিমীরা যে সকলে বুঝেছে তা নয়—তবু তাদের সামনে বাংলাদেশের অবস্থা স্পষ্ট নয়। তারা যা শুনেছে, তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে।

১০.

বাংলার সেদিন এক পৃথক চেহারা।

বাঙালী আজ মৃত্যুকে ভয় পায় না। মিলিটারীকে ভয় পায় না। তাদের মধ্যে আজ প্রতিবাদের ঝড়।

এই অবস্থায় মুজিবর ভাষণ দিলেন ঢাকায় রমনার রেসকোর্স ময়দানে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন তিনি।

রক্তস্নাত বাংলার প্রতিটি মানুষ তখন শুরু করল অসহযোগ—স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সব বন্ধ।

বাঙালীর ঘরে ঘরে উড়তে লাগল নতুন পতাকা। গণহত্যার

বিরুদ্ধে ধিক্কার কালো পতাকা—আর সবুজ, লাল, সোনালী মিশ্রিত বাংলার পতাকা।

নিহতদের বাড়িতে আজ শোক নেই। তার পরিবর্তে তাদের আজ স্থির প্রতিজ্ঞা—বাংলার প্রকৃত দাবীতে তারা অটল।

মানুষের মনেও আজ ভয় নেই।

'পড়ে গেল কাড়াকাড়ি।
কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান।
তার লাগি তাড়াতাড়ি।'

এ এক নব উন্মাদনা। সবাই চায় দেশের জন্য প্রাণ দিতে।

প্রতিটি কর্মীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'জয় বাংলা' গান। তারা গান গায়—

জয় বাংলা, মোদের বাংলা
পদ্মা যমুনা আর মেঘনা
মুক্তিধারার নতুন সীমানা
কোনও বাধা মোরা মানব না।

রাজপথে মহল্লায়, সরকারী ভবনে সর্বত্র আছে আওয়ামী লীগের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক। কারও হাতে কালো পতাকা, কারও হাতে নতুন বাংলাদেশের পতাকা। পাকিস্তানের পতাকাকে তারা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, দোকান কোনও জায়গায় উর্দু সাইনবোর্ড নেই—সব বোর্ড বাংলায় লেখা।

জ্বলন্ত মশাল নিয়ে মিছিল বের করে তারা বেরিয়ে যায় শহীদদের বেদীতে দেয় ফুল আর মালা। তাদের আওয়াজ,—জিন্না বিদায়—স্বাগত সূর্য সেন। স্বাগত মুজিবর রহমান।

এ এক নতুন বাংলা। এ বাংলার নব জন্ম হয়েছে। এর আগে কেউ দেখেনি এ বাংলাকে। এ বাংলার নতুন জন্ম হয়েছে সেই দশ হাজার মানুষকে হত্যা করার দিন—রক্তস্নানের দিন।

হাজার হাজার লোক চলে শহীদদের কবরের দিকে। তাদের চোখে জল নেই—শোক নেই—আছে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আছে সংগ্রামে অচল, অটল সংকল্প।

বাংলার পশ্চিম প্রান্ত যশোহর শহরে প্রাণ দিয়েছিলেন নারী শহীদ চারুবালা কর।

তাঁর মৃতদেহ নিয়ে নীলগঞ্জ শ্মশানের দিকে চলে হাজার হাজার মানুষ। পঁচিশ হাজার লোক সমবেত হয় শ্মশানে। কোনও সামরিক আইন তারা আজ মানে না।

কোনও রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে চালিত এ বাংলা নয়—এ হল আগামী দিনের নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী বাংলা।

বন্দরে, ডকে, এরোড্রামে সব বাঙালী কুলী কাজ বন্ধ করেছে।

জজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে চাপরাশী পর্যন্ত যাচ্ছে না আদালতে। মুজিবের ডাকে সর্বত্র শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন।

সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, রসদ কিছু নামছে না। সব বন্ধ। সমস্ত রকম সরকারী কাজের সঙ্গে চলছে অসহযোগিতা।

স্কুল কলেজ বন্ধ। ছাত্ররা সকলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে নতুন কাজে মেতে উঠেছে।

হাটে বাজারে খাদ্যদ্রব্য পায় না সৈন্যরা। কোনও হাটে, কোনও দোকানে কৃষক বা দোকানদার কোনও সৈন্যের কাছে কোনও জিনিস বিক্রি করে না।

ইসলামাবাদের টনক নড়ে উঠল।

নড়ে উঠলেন ইয়াহিয়া খাঁ।

যতো সহজে তিনি সবকিছুর সমাধান করবেন বলে ভেবেছিলেন—তা ত হলই না—উপরন্তু তরঙ্গ হয়ে উঠল উত্তাল।

ইয়াহিয়া স্তম্ভিত—সচকিত।

পূর্ব পাকিস্তানের এই হরতাল, অসহযোগ, পূর্ণ ধর্মঘট পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টোর ধর্মঘটের হুমকির চেয়ে অনেক বড়, তা তিনি এখন বুঝতে পারলেন। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

পার্লামেন্টের দুই অংশের দুই নেতার মধ্যে এবং পাক-ভারতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার জন্যে ৩রা মার্চ অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়েছে। তাই আলোচনার জন্যে আরও সমঝোতা প্রয়োজন। ১০ই মার্চ ভুট্টো-মুজিবর সমঝোতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কিন্তু মুজিবর এত সহজে ভুললেন না। তিনি বললেন, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে থাকুন। সেই সমস্যা আমি ভুট্টোকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমার সমস্যা হল বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন! বাংলার মাটিতে এখনো পশ্চিমী মিলিটারী দ্বারা অনুষ্ঠিত গণহত্যাব রক্তের গন্ধ। আমরা সংগ্রামে অবতীর্ণ। কোনও সমঝোতায় আমরা নেই। আমাদের সংগ্রাম চলবে। এ হল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন!

* * *

ইয়াহিয়া এই চালে ব্যর্থ হয়ে আর এক নতুন চাল চাললেন।

তিনি ঘোষণা করলেন—২৫শে মার্চ নিশ্চয়ই জাতীয় সভার অধিবেশন বসবে।

একথা শুনে মুজিবর বললেন—আমার ছয় দফা দাবী পরে হবে। আগে আমার চার দফা দাবী পূর্ণ না হলে আমি অধিবেশনে যেতে চাই না। এই চার দফা হল গণহত্যার তদন্ত, সৈন্য অপসারণ, ক্ষমতা হস্তান্তর আর নিহতদের আত্মীয়দের সাহায্য।

৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক দিন। ঐদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঢাকার ময়দানে তাঁর ভাষণ দিলেন। যে ভাষণের কথা আমরা আগেই বলেছি।

উদ্বেলিত জনসমুদ্র শুনল সে ভাষণ। পশ্চিম পাকিস্তানেও গিয়ে পৌঁছাল সে খবর।

তবু ইয়াহিয়া-ভুট্টো-চক্র নির্বিকার।

অবশেষে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করলেন :

আমি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমি গ্রহণ করছি স্বায়ত্তশাসনের ভার। সব টাকা এখানে জমা থাকবে। একটি টাকাও পশ্চিমে যাবে না। শাসনকার্য আমি পরিচালনা কবব। সারা বিশ্ব এ খবর শুনল অবাক বিস্ময়ে।

* * *

৭ই মার্চ থেকে ১৩ই মার্চ—মার্চ মাসের এই দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ববাংলার হত্যাকাণ্ডের পর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

আগের সপ্তাহ আন্দোলনের সৃষ্টিকাল—পরের সপ্তাহ আন্দোলনের পূর্ণ বিস্তারের সময়।

সারা পূর্ববাংলা তখন এই আন্দোলনকে মেনে নিয়েছে। মুজিবরের কথা সমর্থন করতে এসেছে হাজার হাজার পূর্ববাংলার লাঠিয়াল। তাদের হাতে লাঠি আর দেশী অস্ত্র। তারা সেলাম জানায় মুজিবরকে। আমরা প্রস্তুত!

রক্তস্নানের সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলনের বীজ রোপিত হল, তা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পূর্ণ আন্দোলনের রূপ নিল। পরিণতি কি হবে তা কে জানে!

আন্দোলন প্রথম সপ্তাহে চলল পূর্ণ গতিতে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ভুট্টো ছাড়া সব পার্টির নেতাদের সমর্থন পেয়ে আন্দোলন বেড়ে চলল। সকলে সমর্থন জানাল। তাই ভুট্টোর সুর নরম হল।

এদিকে পশ্চিম থেকে এলেন নবনিযুক্ত গভর্ণর টিক্কা খাঁ। তাঁকে কার্যে শপথ গ্রহণ করাতে রাজী হলেন না ঢাকা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস্ বা অন্য কোনও জাষ্টিস্। তাঁরা বললেন টিক্কা খাঁ অবাঞ্ছিত লোক। তাঁকে কেউ শপথ গ্রহণ করাবেন না।

এদিকে পূর্ববাংলায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যখন মুজিবর অচল

অটল, তখন তাঁর কাজে সাহায্য করছেন ও ইন্ধন যোগাচ্ছেন আরও অন্য পার্টি।

চীনপন্থী ভাসানীর ন্যাশন্যাল আওয়ামী লীগ, চীনপন্থী মসিয়ার রহমান ও আনোয়ার সাহিদের গুপ্ত কম্যুনিষ্ট সংগঠন। এই সব সংগঠন পরেও শুরু করেছে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের দুর্বার এক আন্দোলন। যশোহর, চুয়াডাঙা, বরিশাল, শ্রীহট্টে এরা পরে মুক্তিফৌজের সঙ্গে সহায়তা করেছে ও করছে।

সশস্ত্র বিপ্লবের দেশ এই পূর্ববাংলা। অন্যের দেশ কাশ্মীরে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে গিয়েছিল পাকিস্তান। অথচ আজকে নিজের দেশে তারা এ বিপ্লবকে স্বীকার করছে না। তারা বলছে, এটা বে-আইনী।

ঠিক এমনি সময়ে সামরিক আইন জারি করে বসলেন ইয়াহিয়া সরকার।

তাঁরা বললেন :

১৫ই মার্চ বেলা দশটার মধ্যে যদি সব সরকারী কর্মীরা কাজে যোগ না দেয়, তাহলে তারা হবে বরখাস্ত। তারা আর আমাদের কর্মচারী নয়। সামরিক আইনে তাদের হবে কঠিন বিচার।

কিন্তু তাঁরা জানেন না—কেউ শুনছে না এই সামরিক আইনের কথা। তাদের এক কথা—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।
পার হতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁসিয়ার॥

সামরিক সরকার তাই হয়ে পড়ে এক রকম শক্তিহীন। তাদের সামনে আছে এক নতুন সরকার। সে হল জনগণতান্ত্রিক সরকার।

পূর্ববাংলার অসহযোগীরা এখন সামরিক সরকারের সঙ্গে অসহযোগী।

পূর্বপাকিস্তানের পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছেন জনগণতান্ত্রিক প্রতিনিধি শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর এতে পূর্ণ অধিকার।

তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে বাধা দিতে সাহস করেনি মিলিটারীরা।

তাছাড়া আর একটা কারণ ছিল।

ইয়াহিয়া খাঁ ভাল করেই জানেন যে, তিনি কত সীমাবদ্ধ।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বিভেদ সৃষ্টি করে মুজিবরকে দমন করতে ভুট্টো যে বিমান চুরির পরিকল্পনা করেছিলেন তার ফল হয়েছে খারাপ। প্রচুর ভোটাধিক্যে জয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণ সিং সোজা নির্দেশ দিয়েছেন—ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের কোনও প্লেন আর যাবে না। প্রবেশ করলে তাকে গুলি করে নামান হবে।

তারপর পাকিস্তানের যে সামরিক ক্ষমতা, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দমন করার তা উপযুক্ত নয়। তা অনেক সীমায়িত।

ইয়াহিয়া খাঁ তাই চাইলেন কিছুটা সময়। জাহাজে করে পূব বাংলায় সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে যেতে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে আপাততঃ কিছুটা সময় ক্ষেপন করা প্রয়োজন। তা হলে তার পরে সারা পূর্ব বাংলাকে সৈন্য দিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে। প্রয়োজন হলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে নিধন বা ভিটে ছাড়া করা যাবে।

ঠিক সেখানেই গড়ে উঠবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিজয় পতাকা—প্রয়োজন হলে চীন আর পশ্চিমী বিজয় পতাকা।

তাই ইয়াহিয়া চান সময়। তা না হলে তিনি নিরুপায়।

শয়তানের মুখপাত্র ইয়াহিয়া জানেন তাঁর বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে না পৌঁছান পর্যন্ত যতটা ক্ষমতা তাঁর আছে, তাতে তিনি বাংলাদেশের এই জাগ্রত শক্তিকে তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

তাই তিনি করলেন নতুন ঘোষণা।

প্রেসিডেণ্ট মুজিবরের সঙ্গে আলোচনার' জন্যে অবিলম্বে

পূর্ব পাকিস্তানে আসছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে জনগণের মনোমত সরকার প্রতিষ্ঠা।

এদিকে মুজিবর রহমান ১৩ই মার্চ শেষ ঘোষণা-বলে শাসনভার গ্রহণ করেন—তাতে অবশ্য তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেননি।

তিনি বলেছেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা করা হলে তা প্রতিরোধ করার জন্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এবং আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের সাহায্য করবে।'

—রেডিও অস্ট্রেলিয়া।

বাংলাদেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন শেখ মুজিবর রহমান। প্রতিটি বাঙালী একই বিকল্প সরকারের সৈনিক। বুদ্ধিজীবী থেকে প্রতিটি কৃষক, মজুর, সব। তাঁরা রক্তের মূল্যে রক্ষা করবেন এই সরকারকে। ইয়াহিয়া খাঁর সব হুকুম বানচাল হয়ে গেছে।

বাঙালীর চোখে ইয়াহিয়া আজ বিশ্বাসঘাতক আর নরহন্তা। তিনি মানুষ নন—জানোয়ার!

ভুট্টো আর ইয়াহিয়া মিলে তাই যে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার কথা বলেছিলেন তা আজ নিষ্ফল। ভুট্টো চান ভাগাভাগির প্রশ্নে দুই পাকিস্তান—আর ক্ষমতা ও পাঞ্জাবী শাসন কায়েম রাখার প্রশ্নে এক পাকিস্তান। পূর্ব ত চিরদিন পশ্চিমের দাস। তারা আবার চায় স্বাধীন হতে? দাসের পক্ষে এটা অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু ইয়াহিয়া?

তিনি ভাবলেন, পূর্বকে ছাড়া যখন তাঁদের চলবে না—পূর্ব যখন তাঁদের জমিদারী—তখন ছলে, বলে, কৌশলে জমিদারীটা রাখতে হলে, তা কেমন আছে একবার দেখা উচিত।

যদি কৌশলে জমিদারীটা রাখা যায় ত ভাল। তা যদি না যায়, লেঠেল অর্থাৎ মিলিটারী ত আছেই। দুই একদিনে দুচার হাজার মানুষ মারলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু মুখে ত তা বলা চলে না। তাই ইয়াহিয়া সব ব্যবস্থা করবেন ও মুজিবকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন এই ভাঁওতা দিতে এলেন সোজা ঢাকা শহরে।

আওয়ামী লীগের লোকেরা অতি সরল। তারা খুশী হল যে এত সহজে মীমাংসা হবে—তারা পাবে তাদের ইপ্সিত স্বায়ত্তশাসন অধিকার।

সকলের মনে প্রশ্ন ছিল—ইয়াহিয়া খাঁ কি চান? শান্তি না সংগ্রাম?

কিন্তু চতুর ইয়াহিয়া। আসলে তিনি চান সংগ্রাম—কিন্তু মুখে বললেন, আমি শান্তি চাই। চাই আলোচনা।

তাই মুজিবরের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে ইয়াহিয়া এলেন বাংলায়।

তিনি এলেন মুজিবরের সঙ্গে আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে।

মুজিবর বললেন—পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমাদের অতিথি। তাঁর সঙ্গে কেউ যেন কোনও বিরুদ্ধাচরণ না করে। আসলে মুজিবর এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে—বাংলাদেশ স্বাধীন। ইয়াহিয়া বাইরের অতিথি মাত্র। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম থেকে বিচ্ছিন্ন, মুজিব সেই ইংগিতই দিতে চেয়েছিলেন।

* * *

মুজিব সেদিন জানতেন না যে, ইয়াহিয়া খাঁ কোনও সুস্পষ্ট মীমাংসা করতে আসেননি। এমন কি তিনি যে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন—তা আলোচনার জন্য নয়—তা শুধু সময় ক্ষেপের একটা কৌশল মাত্র।

তিনি কেন, আওয়ামী লীগের কেউ তা কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁরা তাই ইয়াহিয়া খাঁর আগমনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে জাহাজে হাজার হাজার মিলিটারী ও অস্ত্রশস্ত্র আসছে, তা তাঁরা আদৌ জানতেন না।

আলোচনা চলল কদিন ধরে। রোজ ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবরকে আলোচনয় ডাকেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আছেন পশ্চিমী অনেক নেতা। মুজিবের সঙ্গে প্রথমে কেউ ছিল না। পরে তিনি আলোচনার সাক্ষী ও উপদেষ্টা রূপে অনেককে সঙ্গে রাখতেন।

ইয়াহিয়া খাঁ বললেন, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই বাংলায় এসেছেন। শুধু মুজিবরের সঙ্গে ভালভাবে আলোচনা করতে চান।

মুজিবরের এক কথা। ছয় দফা দাবী থেকে তিনি একচুলও নড়তে রাজী নন। এই দাবী থেকে নড়লে তা হবে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। তা তিনি করতে পারেন না।

কদিন ধরে আলোচনা চলল। ইয়াহিয়া কখনো সম্মতি জানান —কখনো বা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে বলে সময় কাটান।

অবশেষে ইয়াহিয়া বললেন—তিনি একা ত কিছু করতে পারেন না। তাঁর চাই আলোচনা করার সময়। অবকাশ। তাই তিনি পশ্চিমের সবচেয়ে বড় নেতা ভুট্টোকে আহ্বান জানালেন।

এ সবই যে কালক্ষেপ করার কৌশল মাত্র, তা সেদিন কেউ বুঝতে পারেননি।

ভুট্টো এলেন রক্তস্নাত পূর্ব বাংলার বুকে।

তিনি এসে উঠলেন হোটেলে। যে হোটেলে তিনি ছিলেন তার সামনে হাজার হাজার ছাত্র মিছিল করে বের হল। তাদের মন আজ বিদ্বেষে পূর্ণ। তারা বললে—ভুট্টোকে নিয়ে নাস্তা করব। তাকে এখানেই শেষ করা হবে।

ভুট্টো আছেন কড়া মিলিটারী প্রহরার মধ্যে। তিনি বুঝলেন পূর্ব বাংলার আগুনের তেজ কত।

কিন্তু তবু তিনি তাঁর সংকল্পে অটল।

তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—আমাকে নিয়ে যারা 'নাস্তা' করতে চায়—তাদের শিক্ষা দিতে হবে।

কিন্তু মুখে তিনি তা বললেন না।

ইয়াহিয়ার শিক্ষা মত তিনি মুখে বললেন মধুর ভাষণ। তিনি যেন আলোচনা করে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করতেই এসেছেন।

১১

শুরু হল আলোচনা।

একদিকে ইয়াহিয়া আর ভুট্টো—অন্যদিকে শেখ মুজিবর আর তাঁর দলের কিছু লোক।

সকলে ভাবলো এটা একটা সত্যিকারের আলোচনা হচ্ছে। এতে কাজ হবেই।

তা বিশ্বাস করলেন মুজিবর নিজেও। তিনি ভাবলেন যে, এই আলোচনা ব্যর্থ হবে না—হতে পারে না।

কিন্তু তিনি বা তাঁর দল কখনো ধারণাও করতে পারেননি যে এর পেছনে কি গভীর চক্রান্ত জাল রচনা করে চলেছেন ভুট্টো আর ইয়াহিয়া।

১৪ই মার্চ পর্যন্ত আলোচনা চলল। দীর্ঘ এক সপ্তাহ ধরে চলল কথাবার্তা।

ইয়াহিয়া বললেন যে তিনি মুজিবের দাবীর বিষয় চিন্তা করে চলেছেন। তিনি এটা পূর্ণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

সকলে ভাবলে ভুট্টো-ইয়াহিয়া-চক্রের বোধহয় শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। তাঁরা আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান।

এদিকে মুজিবের ঢাকার ভবন তখন একটা সরকারী হেড কোয়ার্টারে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি সরকারী কর্মচারী মুজিবের নির্দেশ মত কাজ করে। এমন কি ঢাকার প্রধান বিচারপতি টিক্কা খাঁকে শপথ পাঠও করাতে রাজী হননি।

সব দেখলেন, শুনলেন, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো।

তাঁরা রাগে, ক্ষোভে জ্বলে মরতে লাগলেন। তাঁদের এত সাধের পূর্ববাংলা হাতছাড়া হলে তাঁরা ত না খেয়ে মরবেন। তাঁদের সব উজীরি, আমীরি ধ্বংস হবে।

তাঁরা তবু চুপ করে রইলেন। এখন কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

২৪শে মার্চের আগে পশ্চিমী সব পার্টির লোকজন বিদায় নিলো। কেবল রইলেন ভুট্টো আর ইয়াহিয়া।

দুজনে পরামর্শ করেন গোপনে। কি করা যায়? পূর্ব বাংলার এত সাধের জমিদারী তাঁরা ত্যাগ করবেন কি করে?

প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল।

২৫শে মার্চের আগেই গভীর রাতে তাঁরা মিলিটারী লরীতে করে চলে গেলেন সোজা এরোড্রামে। গভীর রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিলেন ইয়াহিয়া আর ভুট্টো।

তবে এটাই শেষ নয়।

তাঁরা মিলিটারীকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, পূর্ব বাংলার সব অধিবাসীর উপরে এমন অত্যাচার করতে হবে, যার ফলে তারা বশ্যতা-স্বীকার করে।

তাই হল।

ভুট্টো আর ইয়াহিয়া চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী শত্রুরা যে অত্যাচার শুরু করল তার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে নেই।

জাতিধর্মনির্বিশেষে শিশু, নারী ও পুরুষদের উপরে শুরু হল অকথ্য অত্যাচার—নির্বিচারে গুলি বর্ষণ।

শুধু ঢাকা নয়—সারা পূর্ববাংলা জুড়ে শুরু হল গণহত্যা। গণহত্যা বললে ভুল হবে—এ হল অগণন হত্যা। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সম্ভব হলে একদিনে হত্যা করতে চায় তারা।

গ্রামে গ্রামে—শহরে শহরে, শুরু হল এই গণহত্যা। শহরের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বুদ্ধিজীবী মানুষদের তারা হত্যা করল। গ্রামে তারা প্রথমে প্রবেশ করেনি প্রতিরোধের ভয়ে। পরে যখন যে গ্রামে প্রবেশ করল, সেখানে যাকেই সামনে পায়, তাকেই কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করে।

মাত্র একদিনে কি দুদিনে ঢাকা শহরে প্রাণ হারালো পঞ্চাশ হাজার মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল।

বড় বড় শহরে গড়ে উঠল প্রতিরোধ।

বাংলাদেশের পুলিশ, ই. পি. আর, আনসার বাহিনী থেকে, এম পি, এস্. ডি. ও, ডি. আই. জি. প্রভৃতি সব বাঙালী অফিসার হল বিদ্রোহী।

বাঙালীর উপরে এই অত্যাচার তারা সহ্য করতে রাজী নয়!

সকলের মুখে এক ধ্বনি—জয় বাংলা!

দেশের জন্যে সকলে হাসি মুখে প্রাণ দিতে আজ প্রস্তুত।

ঢাকার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৈন্যরা কয়েক'শ মেয়েকে টেনে বের করল। কিছু মেয়ে আত্মহত্যা করল—বাকিরা হল অত্যাচারিতা।

পুরুষদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে মেয়েরাও যুদ্ধে যোগ দিল। অস্ত্র নেই—তাতে কি? হাতের সামনে যা অস্ত্র পায়, তাই নিয়ে যুদ্ধ করে।

যখন যে শহরে হানদারেরা প্রবেশ করে সেখানেই শিশু, বৃদ্ধ,

পুরুষদের হত্যা করে। নারীদের কিছু মারা পড়ে—যুবতীদের সৈন্যরা নিয়ে চলে যায় নানা অত্যাচারের জন্যে।

সারা পূর্ববাংলা জুড়ে হানাদারেরা যে অত্যাচার করে চলল, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

নাৎসী নায়ক হিটলারের ইহুদী মারণযজ্ঞের ইতিহাসও আজ ম্লান হল পূর্বাংলার বুকে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের সামনে।

এখানেই শেষ নয়।

গ্রামে গ্রামে আজও চলেছে অত্যাচাব। যেখানে মুক্তিফৌজ হেরে যায়, সেখানেই হানাদারেরা করে অত্যাচাব।

লক্ষ লক্ষ নারী, শিশু, বৃদ্ধ শরণার্থী হয়ে আসছে ভারতে।

অবিরাম তারা আসছে ও আসবে।

ঢাকায় ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক আসলে ধাপ্পা ছাড়া কিছুই ছিল না। ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানেব বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। তাই বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত ঘানা দ্বীপ হয়ে পূর্বাংলায় প্লেনে সৈন্য আনা হচ্ছিল। তাছাড়া জাহাজে চট্টগ্রাম আর খুলনার চালনা বন্দর দিয়ে এসেছিল দশ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য। এইভাবে পূর্বাংলার বুকে এসে জমা হয়েছিল মোট ৭০ হাজার সৈন্য।

তাই আর প্রতীক্ষার দরকার ছিল না। তাই ইয়াহিয়া-ভুট্টো আর অপেক্ষা করলেন না। রাতের আধারে গা ঢাকা দিযে চলে গেলেন। যাবার সময় লেলিয়ে দিয়ে গেলেন সৈন্যদের।

টিক্কা খাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়াল বাংলার জনগন—যে যা পারল তাই অস্ত্র সম্বল করে। আর সঙ্গে ছিল বাঙালী পুলিশ, আনসার হোমগার্ড, বেঙ্গলি রেজিমেণ্টের সৈন্য এবং পাকিস্তান রাইফেল্‌স্‌ বাহিনীর সৈন্যগণ।

বৃহস্পতিবার (২৫, ৩, ৭১) মাঝরাতে পশ্চিম পাকিস্তানী

সৈন্যরা ঢাকার পিলখানা আর রাজারবাগে বাঙালী সৈন্য ও পুলিশদের অস্ত্র কাড়তে গেলে বাধল লড়াই।

কিন্তু টিক্কা খাঁ যে বাঙালী পুলিশ ও সৈন্যদের অস্ত্র কাড়তে চেষ্টা করবে তা বাঙালী আই. জি. প্রভৃতি বড় বড় অফিসাররা আগেই ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তাই বাঙালী সৈন্য ও পুলিশরা আগেই তৈরী ছিল লড়াই করার জন্যে।

আওয়ামী লীগও তৈরী ছিল। মুজিবরও আগেই ঘোষণা করেছিলেন—আমরা সব সময় মীমাংসার জন্যে আলাপ-আলোচনা চালাব—কিন্তু শেষ সংগ্রামের জন্যে সব সময় থাকব প্রস্তুত।

যাই হোক, এদিকে সামবিক প্রশাসক টিক্কা খাঁ এক আদেশ জারী করলেন। পূর্ববাংলার সব রাজনৈতিক দল বন্ধ, লোক সমাবেশ দেখলেই গুলি করা হবে, সংবাদ প্রতিষ্ঠান বন্ধ, ব্যাঙ্কের টাকা তোলা বন্ধ—সাধারণ নাগরিকের সব অস্ত্র সরকারে জমা দিতে হবে।

কেউ মুখে 'জয় বাংলা' কথা উচ্চারণ করলে বা স্বাধীন বাংলার পতাকা তুললে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এদিকে গুজব উঠল—ইসলামাবাদ থেকে ঘোষণা করা হল, মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু পরে শোনা গেল না, তিনি তাঁর গৃহ থেকে উধাও হয়ে গেছেন।

তিনি যে কোথায় গেলেন—তা জানা গেল না। জোর গুজব চলতে লাগল—তিনি নিহত না হয় ধৃত।

শুক্রবার (২৬. ৩. ৭১) সকাল ৯টা ৮ মিনিট। কোনও অপরিচিত স্থান থেকে বেতার যন্ত্রে ভেসে উঠল মুজিবরের ঐতিহাসিক ঘোষণা :

'বাংলাদেশকে তাঁবে আনবার জন্যে আমাদের শত্রু পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ বাঙালীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাঙালী সৈন্য, বাঙালী পুলিশ, বাঙালী জনগণ বীরের মত লড়াই করছে,

শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করছে। আমি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর কথা ঘোষণা করছি—বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন। বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। জয় বাংলা।'

স্বাধীন বেতার কেন্দ্র তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন উত্তর-পূর্ব বাংলার কোনও এক গুপ্ত আস্তানায়। সেখান থেকে মুজিবর আর তাঁর সহযোগীগণ পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন। আজও তিনি জীবিত—কিন্তু বিশেষ কোনও কারণে তিনি আত্মগোপন করে আছেন বলে শোনা গেল।

এদিকে তখন সারা বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছে জঙ্গীশাসকের ভয়াবহ অত্যাচার ও নারকীয় ধ্বংসলীলা।

শহরে শহরে বাঙালীর বেতার, টেলিভেশন, সংবাদ প্রাতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকার রক্ষার জন্যে ছুটেছে ফৌজ।

হাজার হাজার বাঙালী প্রতিরোধ করতে আসছে—কিন্তু গুলিগোলার মুখে প্রাণ হারাচ্ছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে। হাজার হাজার মানুষ বের হয়েছে ঘর ছেড়ে পথে। ট্যাঙ্ক, কামান আর প্লেনের বোমাবর্ষণকে তুচ্ছ করে লাঠি, তীর, ধনুক, বল্লম. সাধারণ বন্দুক যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে বের হয়েছে লড়াই করতে—লড়াই করে প্রাণ দেবার জন্যে।

অবশ্য পুলিশ, আনসার, হোমগার্ড ইত্যাদি নিয়ে তৈরী হয়েছে মুক্তিফৌজ। বহু আওয়ামী লীগ নেতা তাতে সামিল হয়েছেন।

জনতা রেললাইন তুলছে, পুল ভাঙছে, ব্রীজ ওড়াচ্ছে। বড় বড় রাস্তা কেটে বিরাট খাদ তৈরী করে তার উপরে বিছিয়ে দিচ্ছে আলকাতরা মাখানো কালো কাপড়।

যদি কোনও মিলিটারী গাড়ি ঐ পথে আসে—সঙ্গে সঙ্গে তা খাদে পড়ে যায়—তখন চারধার থেকে মুক্তিফৌজ অবিরাম গুলিবর্ষণ করে তাদের খতম করে।

আরও নানা কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধ করে মুক্তিফৌজ। গ্রামের মধ্যে ঢুকতে গেলে চারধার থেকে এমন আক্রমণ করে যে তারা খতম হয়।

এদিকে ইসলামাবাদ বেতার থেকে পাক প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন: মুজিবর রাজদ্রোহী। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ। পূর্ববাংলায় 'জয় বাংলা' শ্লোগান নিষিদ্ধ।

স্বাধীন ঢাকা বেতার কেন্দ্র আজ নীরব—তা এখন পাক সৈন্যদের দখলে। এই বেতার কেন্দ্র বন্ধ হবার আগে শেষ ভাষণ দিয়েছিল নাজমা আখতার: পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জঙ্গী শাসক ন্যায় ও সাম্যের উদ্যোক্তা ইসলামের নাম করে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে হত্যা করছে নিরস্ত্র বাঙালীদের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এখন থেকে পূর্ব অঞ্চলের কোনও গোপন ঘাঁটি থেকে কাজ করবে।

২৬শে মার্চ শুক্রবার আবার শোনা গেল ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় মুজিবরের কণ্ঠস্বর:

'সমগ্র বাংলাদেশ সহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির অনেক জঘন্য প্রয়াস পৃথিবীর ইতিহাসে আছে, কিন্তু এমন নজীর আর দ্বিতীয় নেই।

আজ সারা দেশ সামরিক শক্তির দাপটে, প্রচণ্ড নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষত-বিক্ষত। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী জনসাধারণ তাদের উপরে আঘাত হেনে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলছেন। ক্যানটনমেণ্ট এলাকার স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদারচক্রীদের দল প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় শত্রুবাহিনী শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। কুমিল্লা থেকে সৈন্য এনে তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই. পি. আর, ও অন্যান্য শক্তি তাদের মোকাবিলা করার জন্যে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আজ মুক্তি-পাগল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতার নিকট আহ্বান জানাই—শত্রু সেনাদের মোকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিন। শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে তাদের উপরে মরিচের গুঁড়ো, সোডার বোতল ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিন। সম্ভব হলে হাতবোমা নিক্ষেপ করুন।

গ্রামের ভাইদের কাছে আবেদন, তাঁরা দলে দলে শহরের দিকে অগ্রসর হোন। ক্যান্টনমেন্ট দখল করার কাজে তাঁরা মুক্তিসেনাদের সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মুক্তিসেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য চালিয়ে আমাদের এই দুর্বার আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন।

বন্ধুগণ, আজ উৎকণ্ঠায় সারা দেশের মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠেছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরপরাধ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনগণের উপরে ওরা নারকীয় হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে—দেখামাত্র তাদের গুলি করে মারছে। হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ করছে। এর নজীর বিশ্বের ইতিহাসে নেই।'

এই বেতারে আরও জানা যায় মুজিবরের সংযোগকারী দূত বিদেশী শক্তির সাহায্য নেবার জন্যে দেশের বাইরে রওনা হয়েছেন।

সন্ধ্যায় মুজিবরের এই ঘোষণার আগে পর্যন্ত লক্ষাধিক লোক সারা বাংলার বুকে প্রাণ হারিয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

গ্রামের সাধারণ জনগণ লড়াই করতে নামলেও তাদের না ছিল অস্ত্র, না ছিল সংহতি।

শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা যুদ্ধ জানত—তাদের কিছু অস্ত্রও

ছিল। তাই নিয়ে তারা যুদ্ধ করছে—মেরেছে বা মারছে। জনসাধারণ মরেছে অনেক বেশি—মেরেছে খুব কম।

বড় বড় শহরে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে সুবিধা করতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোক প্রাণ দিয়েছে সৈন্যদের গুলিতে।

হাজার হাজার নারীকে সৈন্যরা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে—তাদের উপরে যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে—তারপর তাদের হত্যা করেছে।

ইতিমধ্যে শোনা গেল সামরিক প্রশাসক টিক্কা খাঁ আহত—পরে তিনি হাসপাতালে মারা যান। সেটা এখনো সঠিক জানা যায়নি যে, তিনি আহত না নিহত।

ধীরে ধীরে যত দিন কাটতে থাকে, তত হাজারে হাজারে নারী শিশু আতংকে ভারতে পালিয়ে আসেন। ভারত ভরে যায় শরণার্থীতে। দশ লক্ষেরও বেশী লোক এসে গেছে ইতিমধ্যে।

এদিকে সারা পশ্চিমবাংলা আর সারা ভারতে শুরু হয়েছে তুমুল উত্তেজনা।

মোট পাঁচ লক্ষাধিক বাঙালী মিলিটারীর হাতে নিহত হয়েছে। সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সে সংখ্যা যে কোথায় শেষ হবে তা কেউ জানে না।

পশ্চিমবাংলা থেকে সংগ্রামী মেজাজের অনেক তরুণ সংবেদনশীল অন্তর নিয়ে ছুটে গেছে ওপারে—বর্ডার পার হয়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে লুকিয়ে চলে গেছে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে। সেখানে আশী হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট হাজার মুক্তিফৌজ।

অবশ্য ইতিমধ্যে পাকবাহিনীর দশ বারো হাজারেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে।

ইতিমধ্যে পূর্ববাংলায় স্বাধীন সরকার ঘোষণা করা হল মুজিব-নগরের আম্রকুঞ্জে অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্যে।

স্বাধীন বাংলা দেশের নবগঠিত সরকারের সাতজন সদস্যদের নাম নীচে দেওয়া হল। অন্য মন্ত্রীদের নাম এখনো ঘোষিত হয়নি।

১। শেখ মুজিবর রহমান (প্রেসিডেণ্ট)

২। তাজুদ্দিন আহম্মদ (প্রধান মন্ত্রী)

৩। খোন্দকার মুস্তাক আহম্মদ (পররাষ্ট্র মন্ত্রী)

৪। সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উপরাষ্ট্রমন্ত্রী)

৫। ক্যাপ্টেন মনস্তুর আলী (মন্ত্রী)

৬। এইচ্ কামারুজ্জান (মন্ত্রী)

৭। মেজর জেনারেল ওসমানী (প্রধান সেনাপতি)

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে তা স্বীকার করে নেবার জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির কাছে আবেদন প্রচার করা হয়েছে।

পাকিস্তানের ন্যাশন্যাল আওয়ামী লীগের নেতা মৌলানা ভাসানী এই সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি পশ্চিম বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে সারা বিশ্বকে ইয়াহিয়া খাঁর এই নিদারুণ অত্যাচারের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি প্রতিটি দেশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার ও তার জনগণের পাশে দাঁড়াতে। চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি সব দেশের নেতারা তাঁর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছেন।

গোটা একটা জাতি অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। আজ তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য চাই—এটা হল মৌলানা ভাসানীর আবেদন।

* * *

পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের চর আজ শবাকীর্ণ।
শহীদরা জানিয়ে গেল শেষ সেলাম—
বাঙালী জাতি কি হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ?
বিদেশী রাষ্ট্র আছে যতো

মুখে সাম্য আর গণতন্ত্রের বুলি কতো!
হায়, তারা গণহত্যা, নির্মম অগণনহত্যার প্রতিবাদে নির্বাক!
কোথা আজ বিশ্বের বিবেক?
পবিত্র ইসলামের নামে জয়ধ্বজা ওড়াল যারা
এই পরিণামেই কি বিশ্বাসী ছিল তারা?
এ বুঝি এক নব কারবালা।
মদিনা থেকে মক্কার পথে চলেছে লক্ষ হজরত।
বাঙালী যুবকের অস্থি, মজ্জা, বাহুতে আজ নব হিম্মৎ॥

* * *

কোলকাতা ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১।

কোলকাতায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন আজ থেকে বাংলাদেশের—স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাকিস্তানের পতাকা সরিয়ে দিয়ে জনাব হোসেন আলী সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে দূতাবাস ভবনশীর্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। এর আগের মুহূর্তেও শ্রীআলী ছিলেন কোলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার।

দূতাবাস ভবনের প্রধান প্রবেশ পথের দেয়াল থেকে 'পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন' ফলকটি তুলে সেখানে 'বাঙলা দেশ কূটনৈতিক মিশন' ফলকটি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নতুন রাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে, ফলক লাগিয়ে শ্রীআলী ঘোষণা করেন—"এখন থেকে আমি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করছি। শুধু আমি নয়, আমার অফিসাররাও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখন থেকে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্য স্বীকার করছি।"

এই ঐতিহাসিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিমবাংলায় যেন তুমুল আনন্দ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হল।

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলে শ্রীহোসেন আলী ও বেগম হোসেন আলীকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। ফুলে ফুলে তাঁদের ভবন যেন ভরে যায়।

এদিকে পশ্চিমী গোষ্ঠী তাড়াতাড়ি নতুন একজন হাই কমিশনার মাসুদকে পাঠান এখানে অফিস খুলতে। কিন্তু পুলিশ মিলিটারী গার্ড সত্বেও সাধারণ লোক দিনরাত এমনভাবে তাঁকে তাড়া করে যে তিনি শেষে গুপ্ত আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হন। বাধ্য হয়ে পশ্চিমীরা কোলকাতা থেকে তাদের অফিস তুলে নেবে বলে ঘোষণা করেছে।

এদিকে কিছু কিছু রাষ্ট্র নব গঠিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার কথা ভাবছেন।

অনেক রাষ্ট্র সাহায্য দান করতে রাজী হয়েছেন।

রাশিয়া অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধের জন্যে ইয়াহিয়া খাঁকে নোট দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া বলেছে—রাশিয়া ও ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছেন।

এদিকে ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কিটিং বলেছেন—ঘটনা যা ঘটেছে বা ঘটছে তাকে মোটেই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা যায় না।

অস্ট্রেলিয়া, জাপান, প্রভৃতি বলেছেন—অবিলম্বে কিছু করা দরকার।

এদিকে ভারতের বুকেও চলছে অবিরাম আন্দোলন—বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে জনসাধারণ উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

ইংলেণ্ডের কমন্স সভায় স্বাধীন বাংলাদেশে রক্ত বন্ধ করার জন্যে তুশোরও বেশি এম্. পি. মিলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের তরফ থেকে কয়েকজন এম্. পি. ভারত সফরে এসেছেন। তাঁদের প্রধান হলেন মিঃ ডগলাস্ ম্যান। তিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য।

তিনি নিজে সমস্ত বর্ডার অঞ্চল ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করলেন।

লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন, তাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি অভিভূত হলেন অত্যাচারের কাহিনী আর বর্ণনা শুনে।

তিনি বুঝতে পারলেন, কি নির্মম অত্যাচার ঘটে গেছে—কত লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে এপারে।

তিনি ঘোষণা করলেন : ভিয়েৎনামের 'মাইলাই' শহরের উপরে মার্কিনীদের যে অত্যাচারের কথা শুনে সারা জগৎ স্তম্ভিত হয়, আজ সারা পূর্ব পাকিস্তান সেই মাইলাতেই পর্যবসিত হয়েছে।

তিনি বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিবর্গের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে দিনের পর দিন যুদ্ধ চলতে চলতে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয় চরমে উঠেছে। পশ্চিম পাকিস্তানকে আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন প্রভৃতি সাহায্যদানে বিরত হয়েছে।

একমাত্র তাকে সাহায্য দিতে রাজী হয়েছে চীন আর তুরস্ক।

মেজর জেনারেল ওসমানী বলেছেন :

'আমাদের এ লড়াই বাঁচার লড়াই। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে কোনদিন আর একসঙ্গে বাস করতে পারব না। আমাদের সাড়ে সাত কোটি লোকের মধ্যে না হয় এ লড়াইয়ে এক কোটি লোক মরবে। বাকি সাড়ে ছয় কোটি লোক স্বাধীন বাংলায় সুখে শান্তিতে বাস করবে। এই সংকল্প ও মনোবল স্বাধীন বাংলার মুক্তিফৌজের একমাত্র অস্ত্র। কিন্তু তবু শোনা যাচ্ছে, ঢাকায় পুরোনো মুসলীম লীগ, ধর্মান্ধ জামাতে ইসলাম প্রভৃতির দু দশজন পদলেহী বিভীষণ জেগে উঠেছেন। তাঁরা পশ্চিমী সৈন্যদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করছেন।

ঢাকার ভাঙা রেডিও থেকে ঐ সব বিভীষণ ঘোষণা করেছেন—এ সব ভারতীয় হানাদারের কাণ্ড। মুজিবর দেশদ্রোহী। আওয়ামী

লীগের প্রতিটি নেতাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে দশ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে।

এই সব মীরজাফরেরা কি করে ভুলে গেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের রক্তে আর গোলাগুলির গন্ধের মধ্যে এখনো যে ইয়াহিয়ার উদ্ধত শাসনলিপ্সার পরিচয় ঘুরে বেড়াচ্ছে—তা কি তাদের ক্ষমা করবে? সুযোগ পেলে, কাজ মিটে গেলে তাদের মত বিভীষণদের খতম করতে ওরা কসুর করবে না—কারণ বাঙালী জাতিই আজ ওদের কাছে শত্রু—তাদের হত্যা করেই ওদের আনন্দ।

১২

বাংলাদেশের যুদ্ধের একটি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

২৫শে মার্চ (১৯৭১) যে অত্যাচার ও প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল ২৫শে এপ্রিল (১৯৭১) তার একটি মাস পূর্ণ হয়ে গেছে।

এই একটি মাসে দিনের পর দিন যে ঘটনাবলী ঘটে গেছে তার একটা হিসেবনিকেশ খতিয়ে দেখা যাক এবার।

গত একমাস ধরে একদিকে ঘটেছে চরম পৈশাচিক গহত্যা। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, ছাত্র, কৃষক, মজদুর কেউ রেহাই পায়নি হানাদারদের বুলেট থেকে।

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐতিহাসিক বীরত্বের কাহিনীও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে হয়তো একটা বিশাল মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। তাই এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

২৫শে মার্চ—শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন তিনি নীতিগতভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী। এদিকে পাকিস্তানী ফৌজ নিরস্ত্র বাঙালীদের ওপরে গুলিবর্ষণ শুরু করল। ইত্তেফাক অফিসে হল হানা। বহু সাংবাদিক ও কর্মী নিহত হল। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো গভীর রাতে পলায়ন করলেন।

২৬শে মার্চ—বাংলাদেশের মানুষ পাক সৈন্যের বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল। মুজিবর রহমান সকালে ও সন্ধ্যায় ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন। তিনি জানালেন সংগ্রামের আহ্বান। ইয়াহিয়ার পশ্চিম থেকে বেতার ভাষণ—আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ। সব অস্ত্র জমা দিতে হবে। ঢাকা থেকে বিদেশী সংবাদিকদের জোর করে বহিস্কার করা হল।

২৭শে মার্চ—ঢাকার পাক সামরিক শাসক টিক্কা খাঁ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত (?)। ট্যাঙ্ক ও বিমান থেকে গোলা ও বোমাবর্ষণ। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা—ভারত সময়মত ব্যবস্থা নেবে।

২৮শে মার্চ—বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার গঠিত। টিক্কা খানের চার জন সহকারী নিহত। কুষ্টিয়া দখল সম্পূর্ণ। ঢাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ। কোলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু।

২৯শে মার্চ—পূর্ববাংলা থেকে ভারতে বহু উদ্বাস্তুর আগমন শুরু। পাকবাহিনী অবরুদ্ধ। সাহায্যের জন্যে দু স্কোয়াড্রন বিমান ও ট্যাঙ্ক। বাংলাদেশে গণহত্যা। নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের তৎপরতা।

৩০শে মার্চ—বাংলার প্রায় অধিকাংশই মুক্তফৌজের দখলে। মুক্তিফৌজ কর্তৃক পাক হানাদারদের বহু অস্ত্র দখল। বাংলার জনগণের প্রতি একাত্মবোধ জানিয়ে সরকারের প্রস্তাব। বাংলাদেশের মানুষের আবেদন—অস্ত্র দিন, আর কিছু আমরা চাই না।

৩১শে মার্চ—কক্স্‌বাজার বিমান ঘাঁটি মুক্তিফৌজের দখলে। ওপারের যুদ্ধে এপারের সমর্থন। পশ্চিম বঙ্গ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য হরতাল পালন করল।

১লা এপ্রিল—চট্টগ্রামে বাঙালী সৈন্যদের বিদ্রোহ। যশোহর মুক্তিফৌজের দখলে। সেণ্ট্রাল জেলের দরজা খুলে ১৩'শ বন্দীর মুক্তি। আন্তর্জাতিক রেড্‌ক্রশের বিমানকে ঢাকায় যেতে দেওয়া হল না। ঢাকায় ছাত্রী রোশেনারা বেগম বুকে মাইন বেঁধে ট্যাঙ্কের সাম্‌নে আত্মদান করলেন, ট্যাঙ্ক ধ্বংস হল।

২রা এপ্রিল—বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম এলাকা মুক্তিফৌজের দখলে। বাঙালী বৈমানিকেরা গোলা ও বোমা বর্ষণ করতে অস্বীকার করলেন। গণহত্যায় রাশিয়ার ক্ষোভ প্রকাশ।

৩রা এপ্রিল—রংপুর বিমান ঘাঁটি মুক্তিফৌজের দখলে। শহর অধিকারে প্রচণ্ড লড়াই। বাংলাদেশের ঘটনায় কোসিগিন উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধ করতে রুশ প্রেসিডেণ্টের আবেদন। ঢাকায় ৯ জন অধ্যাপক হত্যা। রাজসাহীতে বিপ্লবী নেতা বীরেন সরকার, সুরেশ পাণ্ডে প্রভৃতির হত্যার সংবাদ প্রাপ্তি।

৪ঠা এপ্রিল—যশোহরের কর্তৃত্বের জন্যে মরণপণ লড়াই। ভারত চুপ করে থাকবে না—ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা। পাকবাহিনী অবিরাম পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত।

৫ই এপ্রিল—মুক্তিফৌজের দখলে শ্রীহট্ট সেনা-শিবির। বিমান ঘাঁটি, কুমিল্লা শহর ও লালমণিরহাট বিমান বন্দরে মুক্তিফৌজের আক্রমণ।

৬ই এপ্রিল—রাজশাহী ও ময়মনসিংহ মুক্তিফৌজের হাতে। চুয়াডাঙা-রাজবাড়ি স্বাধীন বাংলা রেলপথ চালু। ঢাকায় মোট নিহতের সংখ্যা জানা গেল ৫০ হাজার। ওপারের জনগণের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর।

৭ই এপ্রিল—বগুড়া শহর ও শ্রীহট্ট ক্যাণ্টনমেণ্ট মুক্তিফৌজের

দখলে। চালনা বন্দর অবরোধ। ঢাকায় আবার সংঘর্ষ। যশোহর মুক্তিফৌজের সাঁড়াশী অভিযান। দিল্লীর দুজন পাক কূটনৈতিকের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ।

৮ই এপ্রিল—রাজশাহী ক্যান্টনমেণ্ট দখল। যশোহরের মালঞ্চে তুমুল লড়াই। ব্যাপক হিন্দু হত্যা।

৯ই এপ্রিল—পাঁচটি গানবোট দখল। নীলফামারী মুক্ত পদ্মার তীরে নতুন যুদ্ধফ্রণ্ট।

১০ই এপ্রিল—তিস্তা সেতু মুক্তিফৌজের দখলে। ভারত সীমান্তে ১০ ডিভিশন চীনা সৈন্য। যশোহরে তুমুল যুদ্ধ।

১১ই এপ্রিল—পাবনা সহর পাক দখলে। লালমণিরহাট পুনরায় মুক্তিফৌজের দখলে।

১২ই এপ্রিল—স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা সরকার গঠিত হল মুজিবনগরে। শ্রীহট্ট চাঁদপুর আবার পাক দখলে।

১৩ই এপ্রিল—পাকিস্তানের প্রতি চীনের সমর্থন। সারা বিশ্বে বাংলা সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য আবেদন প্রচার। শ্রীহট্ট আবার মুক্তিফৌজের দখলে।

১৪ই এপ্রিল—দিনাজপুর আবার মুক্তিফৌজের দখলে। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে বিশ্ববাসীকে বাংলা সরকারের আহ্বান। অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা।

১৪ই এপ্রিল—পদ্মায় ডুবে কয়েক'শ পাক সৈন্যের মৃত্যু। মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং-এর মন্তব্য—পূর্ববাংলার বিষয়টি আর ঘরোয়া ব্যাপার নয়।

১৬ই এপ্রিল—শালুটিকর বিমান ঘাঁটি মুক্তিফৌজের দখলে। প্রকৃত তথ্য জানার জন্যে বিশ্ববাসীকে বাংলা দেশে আবার আমন্ত্রণ। চারটি রেল সেতু ধ্বংস। পশ্চিমবঙ্গে এক লাখেরও বেশি আশ্রয়-প্রার্থী।

১৭ই এপ্রিল—প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রকাশ্য অভ্যুদয় ও মুজিবনগতে শতাধিক বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ। কর্ণেল এ. জি. ওসমানী সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত। শালুটিকর বিমান ঘাঁটির তৈলাধার অগ্নিবিধ্বস্ত। পাঁচটি পাক বিমান ধ্বংস। আখাউড়া স্টেশন পাক দখলে।

১৮ই এপ্রিল—কোলকাতাব পাক দূতাবাসে স্বাধীন বাংলা পতাকা উড্ডীন। পাক ডেপুটি হাইকমিশনার এম্. হোসেন আলীর বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। চুয়াডাঙা মুক্তিফৌজের দখলে। আখাউড়ায় পাল্টা আক্রমণ। বাংলাদেশ সবকাবের অস্থাযী সংবিধান রচনা।

১৯শে এপ্রিল—টিক্কা খাঁর (?) ভাষণে গণহত্যার কথা স্বীকাব। তিনি প্রকৃত টিক্কা খাঁ না তাঁর মতো চেহাবার অন্য লোক এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ।

২০শে এপ্রিল—নীলফামারী মুক্ত। দর্শনায় নির্বিচার হত্যালীলা। আরও নানা গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ও নরহত্যার সংবাদ প্রাপ্তি।

২১শে এপ্রিল—রুশট্যাঙ্ক সজ্জিত পাকবাহিনীর ঢাকায় পদার্পণ। কুষ্টিয়া, মোহনপুর পুনর্দখল। আরও গণহত্যার সংবাদ। বাংলাদেশের নেতাদের বিচারের জন্য জঙ্গী আদালতে হাজির হবার নির্দেশ। ভারতের কূটনৈতিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান বিমান যেতে দিল না। ভারত শরণার্থীদের সাহায্য দেবে।

২২শে এপ্রিল—কসবা স্টেশন ও পাকৃসি সেতু মুক্তিফৌজের দখলে। কোলকাতার নতুন ডেপুটি হাইকমিশনারের (মাসুদ) বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। চীন ও আমেরিকার কাছে সাহায্যের জন্যে মৌলানা ভাসানীর আবেদন।

২৩শে এপ্রিল—মৈমনসিংহ ও চট্টগ্রামে তুমুল লড়াই। হিলি হানাদারমুক্ত। ভুট্টোর দলে ভাঙ্গন। সীমান্ত অঞ্চলে শরণার্থীদের

সঙ্গে সাক্ষাতের পর শ্রমিকদলের বৃটিশ এম. পি. ডগলাস ম্যানের মন্তব্য —ভিয়েৎনামে মাইলাই একটি ব্যতিক্রম—আর সারা পূর্ববাংলাই আজ মাইলাই। পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী পাঁচ লক্ষের অধিক। সারা ভারতে আরও বেশি।

২৪শে এপ্রিল—কোলকাতায় পাক দূতাবাস বন্ধ। ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস বন্ধের জন্যে পাকিস্তানের তাগিদ। শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সাহায্য দানের জন্যে রাষ্ট্রসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ।

২৫শে এপ্রিল—পাক হানাদাররা এইদিনকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম দিবস রূপে পালন করবে। নানা স্থানে যুদ্ধ চলেছে অবিরাম। গ্রাম পুড়ানো, নারীধর্ষণ, নরহত্যা।

২৬শে এপ্রিল—বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের প্রাক্তন সৈন্য ও সেনানায়কদের বাংলাদেশে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে পারেন। পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ইয়াহিয়া খাঁকে যুদ্ধাপরাধী বা War Criminal রূপে তাঁর বিচারের জন্যে দাবী করেছেন।

* * *

যুদ্ধ চলছে—চলবে।

পূর্ববাংলার কোটি লোক নিহত হলেও তারা এ যুদ্ধ বন্ধ করবে না এই তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

পাক হানাদাররা দশ হাজারের উপরেও নিহত হয়েছে ও হচ্ছে।

পূর্ববাংলার দাবী—অস্ত্র চাই—আরও অস্ত্র। আর কিছুই চাই না। আমরা মরতে শিখেছি। আমরা হানাদারদের সীমান্তের ওপারে হটিয়ে দেবই।

ভয় নেই—সামনে আসছে বর্ষা।

পাক হানাদারদের অত্যাচারে একটা গোটা জাতি আজ বিলুপ্তির পথে।

সে জাতির একটা লোকও বেঁচে থাকা পর্যন্ত তারা তাদের সাধের মাতৃভূমিকে হানাদারদের কবলে ছেড়ে দেবে না একথা নিশ্চিত।

১৩

এখন চলছে বাংলাদেশে যুদ্ধের দ্বিতীচ পর্যায়।

এর পূর্ব পর্যায়ে যা চলেছে তাকে ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না। তাকে বলা উচিত, পাক বর্বরদের হাতে পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে—নিরস্ত্র বাঙালীকে শুধু বর্বরোচিত হত্যা। পত্রিকার ভাষায় একে বলা হয়েছে, গণহত্যা নয় অগণনহত্যা।

শহরের পর শহরে শুধু জমেছে মৃতের স্তূপ। এত মৃতদেহ যে তাদের কবর দেওয়াও সম্ভব হয়নি বহুদিন।

এবিষয়ে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' যে আলোচনা করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায় কার্যত শেষ। এর পরে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে ঠিক কতদিনের প্রস্তুতি পর্ব চলবে, এখনই তা বলা কঠিন। সামরিক প্রস্তুতি পর্ব ত আছেই।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির খটনা প্রবাহের উপরেও পরবর্তী পর্যায়ের লড়াইয়ের দিনক্ষণ অনেকটা নির্ভর করবে।

প্রথম পর্যায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলা চলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের পর্যায়। কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবকরা বাংলাদেশের বাঙালী সৈনিক ও পুলিশ, ই. পি. আর. প্রভৃতি যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছেন, তার তুলনা নেই। দীর্ঘ একমাস ধরে শুধু সামান্য মাত্র অস্ত্র সম্বল করে এবং অতি সামান্য সাহায্য নিয়েই প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে তাঁরা যেভাবে সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং যুদ্ধের কলাকৌশলে শিক্ষিত ও সংগঠিত এক বিরাট

দানবীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন—তা বিশ্বের সব বাঙালীর পক্ষেই গৌরবের।

এই সময় প্রস্তুতি তাদের একরকম ছিল না বললেই চলে।

রাজনৈতিক নেতারা প্রস্তুতি গড়ার জন্য আরও কিছুটা সময় নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রোধের বশে শেখ মুজিবর রহমান ভেবেছিলেন দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে একটি মুক্তি সেনাবাহিনী গড়ে তুলবেন। আপাতত তিনি ছয় দফা দাবীর ভিত্তিতেই দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হাতে নিতে চেয়েছিলেন।

বর্তমানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকতে তাঁর আপত্তি ছিল না। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তিনি তুলতেন আগামী বছর।

এর মধ্যে গড়ে উঠত মুক্তি সেনাবাহিনী। সরকারী ক্ষমতা হাতে থাকলে এই মুক্তিবাহিনী গড়ার কাজেও প্রচুর সুবিধা হতো।

শোনা যায়, তারপর অনিচ্ছুক পাক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে জোর করে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়াই ছিল শেখ সাহেবের পরিকল্পনা।

কিন্তু সে পরিকল্পনা মত তিনি এগোতে পারলেন না। কারণ প্রথমত পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের রায় মানতেই রাজী হলেন না। তাঁরা জাতীয় পরিষদের বৈঠকই বন্ধ করে দিলেন। এবং দ্বিতীয়ত জনসাধারণের একাংশ বিশেষ করে ছাত্ররা অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে চাপ দিলেন। ফলে, শেখ মুজিবর সাহেবকে তাঁর পরিকল্পনার চেয়েও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হল।

তারপর যা হল সেটা ইয়াহিয়া খাঁর চাতুরীর সাফল্য এবং শেখ সাহেবের সততার পরিণতি।

ইয়াহিয়া খাঁ দিনের পর দিন শেখ সাহেব এবং আওয়ামী লীগকে ভুল বোঝালেন। শেখ সাহেব যা দাবী করেন, ইয়াহিয়া তার চেয়েও বেশী মেনে নেন, ইয়াহিয়া বারবার শেখ সাহেবকে বোঝান, আপনিই তো উজীরে আজম হবেন। আপনার দয়ার উপরেই তো আমাকে নির্ভর করতে হবে। আপনার দাবী না মেনে পারি? আওয়ামী লীগকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করলেন ইয়াহিয়া খাঁ।

একজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়, আচ্ছা আপনারা ইয়াহিয়ার চক্রান্তটা ধরতে পারলেন না কেন?

সেই নেতা বিস্তারিত ভাবে বললেন—সব ঘটনা। তারপর বললেন—এমন ভাবে কোনও মানুষ ছলনা করতে পারে, মিথ্যাচরণ করতে পারে, তা আমরা সত্যি বুঝতে পারিনি। কোনও মানুষের পক্ষে তা বোঝা বোধহয় সম্ভবও নয়।

তিনি আরও বললেন—যখন সমস্ত বিশ্ব এই আলোচনার বিবরণ জানতে পারবে, তখন বুঝবে ওঁরা কত অসৎ, কত বড় মিথ্যাবাদী। সময় হলে সুযোগ এলে আমাদের নেতাই বিশ্ববাসীকে সব জানাবেন। বললেন, আমরা ভুল করেছিলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু ইয়াহিয়াগোষ্ঠী ওই দশ দিনে যেভাবে কথাবার্তা বলেছেন, যে ভাবে আচরণ করেছেন, তাতে সকলেই এমন ভুল করতেন।

ওঁরা অর্থাৎ আওয়ামী লীগ নেতারা গোড়াতেই একটা বড় ভুল করেছিলেন। ওঁরা বুঝতে পারেননি ইয়াহিয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কি। পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, ওরা পশুর চেয়েও অধম।

২৫ মার্চ বিকেলে আওয়ামী লীগ নেতারা সবটা বুঝতে পারলেন। তখন অবশ্য চূড়ান্ত মুহূর্তের কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকি। পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ তখন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আওয়ামী লীগের পাল্টা প্রস্তুতির তখন আর কোনও সময় নেই।

যদি আওয়ামী লীগ নেতারা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারতেন, তাহলে প্রথম পর্যায়ের লড়াইটা শুধু স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ না হয়ে হত সংগঠিত গণ-প্রতিরোধ। যদি তাঁরা আগে থেকেই গোটা পূর্ববাংলার বাঙালী সৈনিক ও ই. পি. আর. জওয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখতেন, যদি পূর্ববাংলার সেনাবাহিনী ও ই. পি. আর-এর বাঙালী অংশ, আনসার, মোজাহিদ এবং পুলিশবাহিনীর মধ্যে আগে থেকেই একটা বোঝাপড়া হয়ে থাকত, তাহলে প্রথম পর্যায়ের লড়াইটা আরও জোর হত—পাক হানাদাররা আরও বড় আঘাত পেত। ভারী অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসাররা সরিয়ে নিতে পারত না। আর পাকবাহিনীও যেমন সমগ্র পূর্ববাংলাকে হাতে পেলেন তেমনটি পেতেন না—মুক্তিবাহিনীও সর্বত্র একই সঙ্গে আক্রমণ শুরু করতে পারতেন।

কিন্তু আগে থেকে কোন যোগাযোগ না থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রামে যখন প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে তখনও ঢাকার ওপর আক্রমণ শুরু হতে পারেনি।

আবার ঢাকা চট্টগ্রামে যখন লড়াই চলেছে তখন অধিকাংশ জেলা শহরে সেনাবাহিনী প্রায় এক তরফা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

যখন সর্বত্র প্রতিরোধ লড়াই শুরু হল, যখন অধিকাংশ বাঙালী সেনা ই. পি. আর. আনসার, মোজাহিদ এবং পুলিশ পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দিলেন, তখনও তাদের মধ্যে একটা সুষ্ঠু কম্যাণ্ড গড়ে উঠতে পারল না। তাঁরা যে যেমন পারলেন লড়াইয়ে নেমে পড়লেন। ছাত্র এবং যুবকরাও তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। যে যা হাতে পেলেন, তাই নিয়েই তাঁরা নেমে পড়লেন। তখন কম্যাণ্ড এবং নিজস্ব যোগাযোগ গড়ে তোলার সময় এবং সুযোগ তাদের ছিল না।

তার ওপর তাঁদের হাতে শুধু হালকা অস্ত্র। তাও গোলাগুলির অভাব। পারস্পরিক যোগাযোগের বেতার-যন্ত্র নেই—নেই দ্রুত একস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ি। অন্যদিকে পাক সেনাবাহিনী—তাদের হাতে রয়েছে সব আধুনিক অস্ত্র। তারা আগে থেকেই প্রস্তুত। তাদের অফুরন্ত গোলাগুলি। তাদের সঙ্গে অসংখ্য গাড়ি। তাদের রয়েছে ট্যাঙ্ক। সর্বোপরি তাদের হাতে প্রচুর ভারী ও দূরপাল্লার কামান এবং জঙ্গী বিমান।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও মুক্তি সেনাবাহিনী যেভাবে গত প্রায় একমাস যাবৎ লড়াই করেছেন তার তুলনা নেই।

এই লড়াই তাঁরা চালাতে পেরেছেন কারণ এটা তাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম—কারণ এই সংগ্রামে তাঁদের সঙ্গে আছেন সাড়ে সাত কোটি মানুষ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের মুক্তি যুদ্ধ কিন্তু হবে সংগঠিত সংগ্রাম। এই লড়াইয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের একটা কম্যাণ্ড থাকবে। অনেক বেশী হাতিয়ার, ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সবার উপরে লড়াইয়ের একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তবে তখনও অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হানাদারদের চেয়ে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ থাকবে দুর্বল—কারণ তাদের বিমান নেই। তবে বিমানের অভাব পূরণ করতে পারে বিমানধ্বংসী কামান।

ইতিমধ্যেই হানাদারদের চব্বিশটি কামান ধ্বংস হয়ে গেছে। আরও কিছু বিমান ধ্বংস করতে পারলে অনেক সুবিধা—কারণ বিদেশ থেকে ইয়াহিয়া আর খুব বেশী সাহায্য পাবেন না।

তাছাড়া মুক্তিফৌজের আর একটা সুবিধা হল সামনে আসছে বর্ষা। বর্ষায় প্লেন চলবে না, ট্যাঙ্ক চলবে না নরম মাটিতে—তখন অতি সহজে তাদের কাবু করা যাবে।

আর একটা কথা—যা সবচেয়ে বড় কথা—তা হচ্ছে মনোবল। নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ—দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া আর পরের দেশ জবরদস্তি দখল করা যুদ্ধের মধ্যে অনেক প্রভেদ—অনেক তফাৎ।

বর্ষা নামলে বাংলার দুর্ধর্ষ নৌ-যোদ্ধাদের কবলে পড়বে পাকিস্তানী হানাদাররা। তারা সাঁতার জানে না অধিকাংশই। কিন্তু বাঙালী সেই ঐতিহাসিক যুগ থেকে নৌ-যুদ্ধের জন্মে বিখ্যাত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বর্ষার আগে আজ যা শুধু প্রতিরোধ যুদ্ধ—বর্ষা শুরু হলে তা হবে মুক্তিফৌজের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। সে যুদ্ধে বাঙালী মুক্তিসেনার সামনে দাঁড়াতে পারে, বিশ্বে এমন শক্তি দুর্লভ।

তাই ইয়াহিয়া চান বর্ষার আগেই সব দখল করে নিতে। প্রয়োজন হলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে হত্যা করতে।

তবে শুধ্ যুদ্ধই প্রধান কথা নয়। লক্ষ কোটি মানুষ যে আজ উদ্বাস্তু—তাদের অর্থ নেই, ফসল ফলানো বন্ধ, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই—একথা বর্তমান বাংলা সরকারকে ভুললে চলবে না।

আজ হয়তো বিশ্বের অনেক দেশ এগিয়ে আসছে সাহায্য করতে—কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সাহায্যের মনোভাব রাখবে কিনা—তা বিরাট এক সমস্যা। আজ ভারত সাহায্য করতে উন্মুখ—কিন্তু তাদেও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

পাশ্চমী দেশেরা—বৃহৎ রাষ্ট্ররা এতদিন ছিল শুধু নীরব দর্শক। তবে আজ তাদের টনক নড়েছে। বিশেষ করে রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রের।

তারা অবিলম্বে সাহায্য করতে চায় বাংলাদেশের মানুষকে—যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় তারা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতদূর কি হবে তা বলা সত্যিই কঠিন। বিশেষ করে অবিরাম যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়ে চলেছে।

* * *

বিশ্বের জনমত আজ পাকিস্তানী ফৌজের বাংলার উপর নির্বিচার অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত।

প্রথমটা তারা এটাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল—কিন্তু আজ আর সে যুক্তি চলছে না।

ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত কিটিং বললেন যে এটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়—এটা একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। কিন্তু ওয়াশিংটন তাতে সায় দিলেন না। ভবিষ্যতে হয়তো দিতে বাধ্য হবেন—কারণ বিশ্ব জনমত জাগ্রত।

এদিকে রাশিয়া রক্তপাত বন্ধ করার জন্য কড়া চিঠি দিয়েছে। তারা চায় সত্বর এই অত্যাচার বন্ধ হোক

মুজিবর ভারতের মিত্র বলে চীন এতদিন উল্টো সুর গাইছিল। কিন্তু চীনপন্থী মৌলানা ভাসানীও বাঙালী জাতির নামে তাঁদের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেছেন। শুধু তাই নয় পূর্বপাকিস্তানের কোলকাতায় রাষ্ট্রদূত এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। জনাব হোসেন আলী বিশ্বের সব রাষ্ট্রকে বার্তা পাঠিয়েছেন, অবিলম্বে সাহায্যের জন্যে। নানা দেশ তাঁর চিঠির উত্তরে পূর্ববাংলাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আর সর্বশেষ খবর হল ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হয়েছে। ছয় জন ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী ভারত সফরে এসেছেন—পাকিস্তানী ফৌজের বর্বরতা তাঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন যে এটা সম্পূর্ণভাবে সুপরিকল্পিত গণহত্যা। অবিলম্বে এই কাণ্ড বন্ধ করা উচিত।

বিদেশী শক্তিরা, বিশ্বের মানবিকতা যাঁদের হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের এই নৈতিক দাবীকে সমর্থন জানাবেন। তাই মুক্তিফৌজরা যে অবিলম্বে জয়লাভ করবেন—তা শুধু মিলিটারী জয়লাভ নয়—তা হল সারা বিশ্বের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে জয়লাভ।

ইয়াহিয়া খাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। একদিন সারা পাশ্চাত্ত

ভূখণ্ডের ডিক্‌টেটর হিটলার ও মুসোলিনীর যে অবস্থা হয়েছিল তা উপেক্ষা করছে ইয়াহিয়া খাঁ আর তার তাঁবেদার ভুট্টোর দল।

বিশ্বের দরবারে তাঁদের 'ওয়ার ক্রিমিন্যাল' হিসাবে দাঁড় করানো উচিত। জোর করে একটি জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে যারা চাইছে তাদের বিচার নিশ্চয়ই করবে আগামী কালের মানুষ আর স্বয়ং ভগবান!

আমাদের চোখের ওপর ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারত পাকিস্তান মিলিত দেশে এবং এশিয়ায় এক আশ্চর্য নাটক অভিনীত হচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ধাপ্পাবাজী, শঠতা এবং গণতন্ত্র হত্যার সমাধি অবশ্যম্ভাবী।

জাতি-বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়-বিদ্বেষে অন্ধ রাওয়ালপিণ্ডির যে শয়তানী চক্র একদিকে ভারতবর্ষ আর অন্যদিকে বাঙালীর জাতীয় সত্তা আর স্বাধীনতাকে ধ্বংস করবার জন্যে গত চব্বিশ বছর ধরে নিরন্তর শত্রুতা করে আসছিল আজ শুরু হয়েছে তার পূর্ণ প্রতিরোধের পালা।

আজ ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্কে যারা আজ উদাসীন, একমাত্র তারা ছাড়া আর সকলেই উপলব্ধি করেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তরঙ্গ শুরু হয়েছে, আসন্ন দিনগুলিতে সেই তরঙ্গ উত্তাল হয়ে সমগ্র মহাদেশে এক নতুন প্লাবন ডেকে আনবে।

গত ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে এক অনাড়ম্বর উৎসবের মধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী বাংলা রাষ্ট্রের যে উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সংশয়বাদীরা তাকে তাচ্ছিল্য করতে পারেন এবং অতি বুদ্ধিমানেরা তাকে উপহাস করতেও পারেন।

কিন্তু অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকিয়ে আমরা

বলতে পারি যে, রাষ্ট্র-স্বাধীনতার যে বীজ মুজিবনগরে অঙ্কুরিত হয়েছে, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে সে নিশ্চয়ই বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে।

কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বিমান ও বোমা দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জয়যাত্রাকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী হানাদারেরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

তার কারণ হল, যে স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করছে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তাকে বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করবে। জননীর মমতা আর জনকের শক্তি দিয়ে এই নবজাতককে জীবনের পথে অগ্রসর করে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ ও সংশয় থাকা উচিত নয়।

এই পুরোনো পৃথিবী ভেঙ্গে পড়েছে এবং সেই ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড ও রক্ত থেকে নতুন পৃথিবী জন্মলাভ করেছে।

ভুট্টো-ইয়াহিয়া খান এবং ধনিক-বণিক সামরিক চক্র অবশ্যই খেপা কুকুরের মত যেখানে সেখানে কামড় বসাবে, কিন্তু ইতিহাস এই হিংস্র জানোয়ারি বৃত্তির জন্য অপেক্ষা করবে না, তার জয়রথ এগিয়ে যাবে।

বাংলা দেশের স্বাধীন রাষ্ট্র পল্লীর এক নিভৃত ভূমিতে জন্মলাভ করেছে। গ্রামময় বাংলাদেশের পক্ষে এটা স্বাভাবিক।

নিভৃত পল্লীর এই দীপশিখা এর মধ্যেই জ্বলন্ত মশালের রূপ ধারণ করতে চলেছে। স্বাধীন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলার রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিসভা এবং সশস্ত্র বাহিনী নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছেন।

দেশ-বিদেশে এই বার্তা সংবাদপত্র ও রেডিও মারফৎ ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্র নিদারুণ ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা। এই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সব প্রথম বিদেশী দূতাবাস ভারতবর্ষে—এই কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৮ই এপ্রিল কোলকাতায় পাক-ডেপুটি হাইকমিশনের অফিস থেকে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের নতুন জাতীয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে।

ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলী এবং তার সহকর্মী বাঙালী অফিসারবৃন্দ নতুন বাংলা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা সরকারের কূটনৈতিক প্রধানরূপে জনাব হোসেন আলী তাঁর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন।

এর আগেই নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশন থেকে দুইজন বিশিষ্ট বাঙালী কূটনৈতিক পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং নতুন বাংলা বাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তানের অন্যান্য বাঙালী অফিসাব এবং কর্মীরা, নাবিক ও সৈনিকেরাও একে একে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

ওদিকে স্বাধীন বাংলা দেশের সার্বভৌম সরকার সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে এক নতুন রাষ্ট্রীক ঐক্যের মধ্যে সংহত করতে চলেছেন।

সাড়ে সাত কোটী বাঙালী অধিবাসীর অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জন এই নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দ্বারা পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীকে এবং তার নৃশংস নরঘাতী শাসনকে অপরিসীম ঘৃণায় উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করেছেন।

অর্থাৎ একটি সংহত স্বাধীন নতুন রাষ্ট্রেব রূপরেখা বাস্তব মূর্তি ধারণ করেছে।

পর পর এই সব নাটকীয় ঘটনাবলীর কথা আমরা উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, একটি নতুন সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে যে অবস্থার উদ্ভব প্রয়োজন, সীমান্তের ওপারে

স্বাধীন বাংলাদেশে সেই অবস্থাগুলি দেখা দিয়েছে। সুতরাং ভারত সরকার কেন অবিলম্বে এই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, এটাই আমাদের সবচেয়ে জরুরী জিজ্ঞাসা।

নয়া দিল্লীর কর্তারা কি এখনও তীরে দাঁড়িয়ে আরব সাগরের ঢেউ গুণবেন ?

বাংলাদেশে যখন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হচ্ছে, নারী শিশু বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিজীবী নির্বিশেষে পাইকারী হারে নরহত্যা পর্ব চলছে এবং মুক্তিফৌজ যখন অমিত বিক্রম সত্ত্বেও শহরে শহরে মারণাস্ত্র সজ্জিত মডার্ণ আর্মিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না, তখন যদি ভারত সরকার কেবল, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সঙ্কোচ ও ভয় নিয়ে কালহরণ করতে থাকেন, তবে সীমান্তের বিপদ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

ভারত সরকার এবং বিশেষ ভাবে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যেন মনে রাখেন যদি বাংলাদেশ এই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়, তবে আগামী একশ বছরের মধ্যে পূব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না।

সেখানে সমস্ত গণতন্ত্রবাদী অসাম্প্রদায়িক মানুষের এবং বিশেষ ভাবে মাইনরিটিরা একেবারে শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর পশ্চিম পাকিস্তানে জঙ্গীশাহী ও চীন একজোট হয়ে ভারতবর্ষের ঘাড় মটকাবার চেষ্টা করবে—যে চেষ্টা চলছে এক যুগ ধরে।

এই নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে উপেক্ষা করতে পারেন এবং কিভাবেই বা ভুলে যেতে পারেন যে, গত ১৯৪৬ সাল থেকে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব চলছে, যার ফলে ভারতবর্ষকে কেটে দুই টুকরো করতে হল, এবং তারপর থেকে ২৪।২৫ বছর ধরে আমরা নিরন্তর যে যন্ত্রণায় ভুগছি আজ সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তানী অত্যাচার ও বর্বরতার বদলা নিচ্ছে—প্রায় নিরস্ত্র, একক প্রতিরোধ শক্তির দ্বারা।

আর আমরা কি এই পাকিস্তানী উৎপাত ও শয়তানীকে বন্ধ করবার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেব না? সেই শক্ত হাতে কি আমরা কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র তুলে দেব না? কিসের ভয়, কিসের দ্বিধা, কিসের এত সঙ্কোচ?

আজ যদি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকার নতুন বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেন, তবে আগামীকাল সোভিয়েট রাশিয়া এগিয়ে আসবে।

কিন্তু ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী কি আশা করেন যে, আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব আমরা পালন করব না? আমরা কি আশা করব যে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা এসে আমাদের উদ্ধার করবে?

যে সাহসী, যে বীর, তাকেই পৃথিবীর লোকে সম্মান করে। আজ আন্তর্জাতিক জগতে ভারতবর্ষের চেহারা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কিন্তু ভারত সরকার যদি বাংলাদেশের পাশে আজ সাহসের সঙ্গে দাঁড়ান, তবে সেই শক্তিমান ও সাহসী ভারতবর্ষকে পৃথিবীর লোকে আবার সম্মান করবে—শ্রদ্ধা করবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং যেন মনে রাখেন তাঁর এই দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির গোঁজামিল কোথাও শ্রদ্ধা উদ্রেক করছে না।

আজ যদি তিনি ও তাঁর দপ্তর বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেন তবে ভালই। এশীয় দেশগুলিতে ভারত সম্পর্কে নতুন সম্ভ্রমবোধ জাগবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সমগ্র পরিস্থিতি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে।

আর প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের উদ্দেশ্যে বলছি—পার্টিশনের পর থেকে ভারতবর্ষ দুই ফ্রন্টের বেকায়দায় পড়েছে একদিকে পাকিস্তানী এবং অন্যদিকে চীন—এই দুই ফ্রন্টের বিপদ

কেটে যাবে, যদি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। পাকিস্তান ও চীনের একত্র যোগসাজসে ভারতবর্ষের ওপর বিষম চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং হাজার কোটি টাকা মিলিটারী বাবদ ব্যয় হচ্ছে।

এই ন্যুইসেন্স এবং এই সামরিক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় স্বাধীন বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা—যে সাহায্য কূটনৈতিক এবং সামরিক উভয় প্রকার।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য (গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে বর্বরেরা আজ নির্মমভাবে হত্যা করছে) আমরা আবেদন জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে।

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত আইনসভা, এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ঐ সম্বন্ধে দাবী উত্থাপন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামে ভারতীয় জনসাধারণের নিকট শপথ গ্রহণ করেছেন এবং ভারতীয় জনসাধারণও তাঁকে বিশ্বাস করে নির্বাচনে জয়মাল্য অর্পণ করেছেন।

ইন্দিরাজী কি সেই শপথ পালন করছেন? তিনি যেন মনে রাখেন রাষ্ট্র চালনা ও রক্ষা করতে হলে কূটনৈতিক বুদ্ধি ও চাতুর্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহসের এবং কঠিন সরকারের।

সেই কূটনৈতিক বুদ্ধি ও সাহসের মুহূর্ত আজ উপস্থিত। এক শতাব্দীর মধ্যেও এমন সুযোগ আর আসবে না—রাওয়ালপিণ্ডির ফ্যাসিষ্ট দুষমনদের ঘায়েল করতে হবে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, প্রাচীন কূটনৈতিক শিক্ষা নয়াদিল্লীর মন্ত্রী মহোদয়েরা যেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত ভুলে না যান।

গোলাবর্ষণ করছে। তারা জানে যে এই ভাবে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে পারলে তাদের লাভ।

প্রথমত বিদেশের কাছে এই গণহত্যার একটা সাফাই গাইবার সুযোগ হবে। তারা বলবে, ভারতই এটা করিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে বিদেশ থেকে অস্ত্র-সাহায্যও তারা পেতে পারে।

ভারতের যে-সব সীমান্ত অঞ্চল তাদের দখলে সেখানে তারা প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে। উদ্দেশ্যে হল, যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা সৃষ্টি করা।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র আজও মনস্থির করতে পারছেন না, তাঁরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন কিনা।

তাঁদের এই নীরব দর্শকের ভূমিকা দেখে ভারত বিস্মিত হতবাক। ভারত একা কি করে বিশ্বমতের সায় না পেয়ে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেবে?

এদিকে পাকিস্তান যতই প্রচার চালাক যে বিশেষ কিছুই হয়নি তবু তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিরাটভাবে ভেঙে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে তাদের যে বিপুল উপার্জন হত তা আজ প্রায় বন্ধ—তাই সমগ্র পাকিস্তানেরও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে ধীরে ধীরে।

এর ফল অদূর ভবিষ্যতে যে কি হবে তা ভেবে তারা হচ্ছে আতঙ্কিত।

বিশ্বের সব দেশের কাছে আজ পাকিস্তান হল তাই একটি দেউলিয়া দেশ—বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষমতা তাদের নেই—উপরন্তু যুদ্ধে রোজ খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কটি দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তারা এখন দ্বিধা করছে কেন?

এর কারণ হল, পশ্চিম পাকিস্তানের পেছনে চীন এসে দাঁড়ানোর ফলে পরিস্থিতিটা কিছুটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হতে চলেছে—এই অবস্থায় তাকে চটাতে কেউ রাজী হচ্ছে না।

তাই বোঝা যাচ্ছে, আজকের তুনিয়াতে স্বার্থই বড়—মনুষ্যত্ব, বিবেক এসব তুচ্ছ কথার কথা মাত্র।

এদিকে ঢাকার পাক সরকার কতকগুলি বাছাই করা বিদেশী সাংবাদিককে এনেছেন (৭ই মে)। ঢাকা সহর কিছুটা সাফ করে তাদের তা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঢাকার বিরাট ধ্বংসস্তূপ ও জনশূন্যতা দেখে তাঁরা বিস্মিত।

এর উত্তরে ঢাকার মিলিটারী শাসনকর্তারা বলেছেন—আগে এখানকার লোক আক্রমণ করতে এসেছিল, তাই বাধ্য হয়ে আমরা ট্যাঙ্ক কামান চালাই।

লক্ষ লক্ষ গণহত্যার এটা একটা চমৎকার কৈফিয়ৎ বটে; যদিও সে কৈফিয়ৎ সাংবাদিকরা মোটেই বিশ্বাস করেননি।

তু একজন বাঙালী গোপনে বলেছেন, বুড়িগঙ্গার মধ্যে এখনো ভাসছে হাজার হাজার মৃতদেহ। সেখানে সাংবাদিকরা যেতে চাইলে তাঁদের যেতে দেওয়া হয়নি

এদিকে লড়াই কিন্তু চলছেই।

অস্ত্রশস্ত্রে তুর্বল মুক্তিফৌজ এখন রাতের বেলা গোপন অভিযান শুরু করেছে।

তারা জানে, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমর করা বৃথা। তাই বিভিন্ন রণাঙ্গনে তারা রাতের বেলা আচমকা আঘাত হানছে। ধ্বংস হচ্ছে শত শত পাক হানাদার।

এ পর্যন্ত খবর মিলেছে যে, গত দেড়মাসের যুদ্ধে মোট প্রায় পনেরো হাজার হানাদার সৈন্য খতম হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় তিরিশ হাজার পাক হানাদার।

আবার মিলিটারীর মধ্যে বালুচ সৈন্য ও পাঞ্জাবী সৈন্যের মধ্যে নানা জায়গায় গোলমাল চলছে। তার ফল কি হবে, তা কে জানে ?

এদিকে বিশ্ব-জনমত কোন্‌দিকে যায়, তার ওপরেই নির্ভর করছে ফলাফল। যত দ্রুত বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাবে—ততই লোকক্ষয় কম হবে। তা না হলে এই অঙ্ক যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা কেউ জানে না।

পাক হানাদাররা ভেবেছিল ভারতের সব বর্ডার বন্ধ করে তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবে। কিন্তু তাতেও তারা সফল হয়নি। হাজার হাজার মাইলের বিরাট বর্ডার পাহারা দেবে এত লোক তাদের কোথায় ?

পাক হানাদাররা বোধ হয় একটা কথা ভুলে যাচ্ছে যে, যে সব মানুষ ন্যায়ের জন্য, দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে লড়াই করতে নেমেছে, তারা দিনের আলোয় বা রাতের আঁধারে যে কোনও সময়, যে কোনও ভাবেই লড়াই করুক না কেন, তাদের মনোবল অপরিসীম। তাদের এত সহজে দমানো সম্ভব নয়।

এই সহজ সত্যটা বুঝলেও মুখে তা স্বীকার করতে পারছে না ইয়াহিয়া খাঁ।

আর তার ভাড়াটে সৈন্যরা ? তারা কি করবে ? তাদের ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ। হয় লড়াই করে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে—নয়তো মরতে হবে।

যত টাকা ও পরিশ্রম খরচ করে ইয়াহিয়া খাঁ তাদের সুদূর পাঞ্জাব, সিন্ধু বা বেলুচিস্তান থেকে লড়াই করার জন্যে নিয়ে এসেছে, তত টাকা খরচ করে আবার তাদের ফেরৎ নিয়ে যাবার দায়িত্ব তিনি বহন করবেন না। তারা মারুক, না হয় মরুক। বঙ্গোপসাগরের জলে তাদের সমাধি হোক।

এদিকে ঘটেছে আর এক ঘটনা। গত .ঠা মে (১৯৭১) খবর

পাওয়া গেল পূর্ববাংলার বড় বড় কয়েকজন জঙ্গী অফিসারকে ইয়াহিয়া ও পশ্চিমী মহল কটূক্তি করেছে। তারা নাকি লড়াই সন্তোষজনকভাবে করতে পারছে না।

এ যেন নিরুপায়ের কান্না।

একটা গোটা দেশের সাত কোটি নিরস্ত্র মানুষকে কেন মেরে ফেলতে পারছে না হাজার হাজার সৈন্য, এই চিন্তাতেই ঘুম নেই ইয়াহিয়া খাঁর।

কিন্তু তা কোনও দিন সম্ভব হয় না। কারণ দেশটা যাদের, তারাই জয়লাভ করতে পারে—ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে সাময়িক হৈচৈ মহামারী কাণ্ড করা যায় বটে—তবে জাগ্রত জনমতের কাছে তারা অতি তুচ্ছ।

ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন ইয়াহিয়া খাঁ।

কিন্তু তাঁর এই ইসলামী জেহাদ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না মৌলানা, মৌলবী থেকে সাধারণ গরীব চাষী ও দিন মজুর কেউই। মন্দির, মসজিদ সমানভাবে অপবিত্র হচ্ছে। চারদিকে শুধু মানুষের মৃতদেহ—শুধু শব আর ধ্বংস।

সামরিক শাসকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে গুণ্ডা, বদমাস ও নরঘাতী লোকগুলি ছাড়া কোনও সাচ্চা মুসলমান নাকি নেই।

তাই পাক হানাদার অধিকৃত অঞ্চলে হানাদারদের চলছে পোয়াবারো। ইয়াহিয়ার কৃপায় আজ সেই সব গুণ্ডা সর্দারদের কেউ হচ্ছে দারোগা, কেউ হচ্ছে ডেপুটি, এমন কি কেউ কেউ বা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত। ইয়াহিয়ার খাঁটি, নির্ভেজাল ঐসলামিক রাষ্ট্র তৈরী হচ্ছে বাংলাদেশে।

এই প্রচেষ্টার প্রধান বাধা হল মুক্তিফৌজ।

ওদের শেষ করতে না পারলে ইয়াহিয়ার স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেবে না। বাংলাদেশের মসজিদ পবিত্র নয়—পবিত্র হল

পশ্চিমের মসজিদ। সেখানেই ইয়াহিয়া তার জল্লাদ-ব্রতের প্রার্থনা জানাক। তা না হলে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার খেয়ে গুণ্ডা রাজত্বের শিরোমণি হানাদারবর্গের নাভিশ্বাস উঠবে—ইয়াহিয়ার নকল এই ইসলামাবাদের স্বপ্নও মাঠে মারা যাবে।

* * *

গত কিছুকাল ধরে বাংলাদেশের নানা যুদ্ধ অঞ্চল থেকে কোনও রোমাঞ্চকর খবর আসছে না। শুধু যুদ্ধ চলছে ত চলছেই। দুপক্ষেই হতাহত হচ্ছে। তবে মুক্তিযোদ্ধারা সব সময় আত্মগোপন করে থেকে আচমকা গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করছে।

বাংলাদেশের অনেকের মনে তাই মুক্তিযোদ্ধাদের জয় সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে।

ভারতের প্রাক্তন সেনাপতি জে. এন্. চৌধুরী এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মতে পাকিস্তানী মডার্ন আর্মি সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ শুরু করেছে ও যুদ্ধ চালাচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—তাই তাদের সুবিধা করে ওঠা খুব কঠিন।

এই লেখাটা পড়ে অনেকের উৎসাহ হয়ত খুব কমে গেছে।

কিন্তু তিনি একটা কথা লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে এই যুদ্ধ খুবই দীর্ঘস্থায়ী হবে—চট্ করে কোনও পক্ষ জিততে পারবে না।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে সবার আগে। তা হলেও তিনি একজন প্রাচীন সৈনিক—তাই তিনি আধুনিকতম অস্ত্রের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধবিজ্ঞানের চিরাচরিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির দ্বারা তিনি পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণ পর্যায় বিচার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি এই যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদারদের শক্তি বেশি তাই বিচার করে এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। আধুনিক যুদ্ধের কেতাবী বিচার দ্বারাই তাঁর সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে।

তাই তিনি বা তাঁর মত অন্য যে কোন সৈনিকের বিচারে ইয়াহিয়া খাঁর বাহিনীর শক্তি বেশি বলে প্রতীয়মান হতে বাধ্য।

একথা গোপন করে লাভ নেই যে, শেখ মুজিবর রহমান, তাঁর পার্টি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কিংবা তাঁদের সমর্থক জনসাধারণ কেউই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর এমন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের জন্যে তৈরী ছিলেন না।

সামরিক বাহিনীকে সাময়িক কায়দায় প্রতিরোধ করার কোনও রণনৈতিক পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল না। ওঁদের হাতে সৈন্য, অস্ত্র এমন কি উপযুক্ত পরিমাণে গোলাবারুদ পর্যন্ত ছিল না।

তাই এটা সাধারণ ভাবে মনে হতে পাবে যে এই অসম যুদ্ধের ফলাফল সমান হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনও যুদ্ধই নয়। এটা হল মরণাস্ত্রবাহী একটা আধুনিক সৈন্যবাহিনীর নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ মাত্র।

তাই এতে প্রথমেই ঘটেছে নিছক হত্যাকাণ্ড ও ব্যাপক ধ্বংস-লীলা।

কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর পাক ফৌজেরা কেবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই তাদের নৃশংসতা সীমাবদ্ধ রাখেনি।

ইয়াহিয়ার সেনারা টেরার বা ত্রাস সৃষ্টি করে সমগ্র জনসাধারণের মেরুদণ্ড ও নৈতিক বলকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছে। তারা ঘরবাড়ি, মন্দির, মসজিদ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেছে, পুড়িয়েছে—শত শত নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করেছে—এমন কি নারী নির্যাতনের জন্যে পৃথক শিবির পর্যন্ত খুলেছে।

এর দ্বারা তারা যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারেনি তা নয়—প্রচুর ভাবে তা করেছে। তার প্রমাণ ভারতের বুকে ছুটে আসা লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী।

কিন্তু এতে ফল হয়েছে উল্টো। মানুষের মনের তীব্র একনিষ্ঠতা, শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা এতে আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই জেনারেল জে. এন্. চৌধুরীর কথা মানতে হলে বলতে হয়, পৃথিবীতে কোনও নিরস্ত্র জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম করে লাভ নেই। কিন্তু আমরা চোখের সাম্‌নেই দেখেছি নিরস্ত্র ভারতবাসী মুক্তি সংগ্রামে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের সমস্ত পরাধীন, দুর্বল ও নিরস্ত্র জাতিগুলি বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, প্রভৃতি পরাক্রান্ত ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির প্রচণ্ড সামরিক শক্তিকে অতিক্রম করে একে একে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই টেরার বা আতঙ্ক সৃষ্টি করে দমন করে রাখতে চেষ্টা করেছে। আমাদের ভাবতে পর্যন্ত ঘটেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, আরও কত হত্যাকাণ্ড। কিন্তু এই সব হত্যাকাণ্ড থেকেই বৃটিশের পতন শুরু হয়েছে।

সারা ভারতের জনসাধারণের মনে বৃটিশ প্রভুত্বের প্রতি যে ঘৃণা জেগেছিল, নানা প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার চরম পরিণতি ঘটল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্য দিয়ে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সশস্ত্র আক্রমণ ঘটল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি টলে উঠল—তারা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হল।

বাংলাদেশেও আজ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের ভিত্তি টলে উঠেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, খুলনা, যশোহর, শ্রীহট্ট ইত্যাদি শতশত জালিয়ানওয়ালাবাগের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক পালিয়ে এসেছে—হয়তো পাঁচ লক্ষ নিহত হয়েছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না বাংলাদেশের লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ কি তারও বেশি লোক আজ শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের ঘোর বিরোধী।

তাই মুজিবর ও আওয়ামী লীগের সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী স্তরে যখন নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মত বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র পাল্টা আক্রমণ শুরু হচ্ছে

প্রধানত গেরিলা কায়দায়, তখন একদিন তার ফলাফল পাকিস্তানী দস্যুদের পক্ষে মারাত্মক হবে।

তাবা মরছে—মরবে। এইভাবে তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন কমে আসছে। পাকিস্তানী হানাদাববা এর পরিণতি বুঝতে পারছে —তাই মাঝে মাঝেই তারা করাচীব কাছে আরও সৈন্য ও অস্ত্রের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু সেখানে আব কত আছে? তাদের ভাণ্ডার যে প্রায় শূন্য।

নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পরাক্রান্ত বৃটিশ ও আমেরিকার সঙ্গে লড়াই করেছে। আর এ ত অতি সামান্য পশ্চিমী পাক সৈন্য—যাদের অর্থনৈতিক বল অতি সীমিত—যোগাযোগ পর্যন্ত বিপর্যস্ত।

চূড়ান্ত কালে যেমন নেতাজীব পক্ষেরই জয় হয়েছিল সেদিন—বৃটিশ হাত গুটাতে বাধ্য হয়েছিল, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নৃশংস আক্রমণেব বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজেব ও জনগণের এই যুদ্ধও একদিন পাকিস্তানী দখলদাবী শক্তির এবং রাজনৈতিক প্রভুদের চূড়ান্ত পতন ঘটাবে।

একথা সত্য যে, পাকিস্তানী সবকাবী সামরিক বাহিনা নিখুঁত পরিকল্পনা দ্বারা অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু সুদীর্ঘ ছয় সপ্তাহের সমান আক্রমণ ও নরহত্যার পবেও পাকবাহিনী বা পাক সরকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। বাংলাদেশ আজও বশ মানেনি। দিকে দিকে চলছে সমানে অতর্কিত আক্রমণ ও পাক ফৌজ ধ্বংস।

এখানে একটা কথা। যুদ্ধ শুধু যুদ্ধের জন্য নয়—কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণই হল যুদ্ধেব মূলকথা। সেই লক্ষ্য পূরণে ইয়াহিয়া খাঁ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই প্রচণ্ড আঘাতের ফলে অজস্র মানুষের রক্তের ভেতর দিযে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র ও নতুন লোকায়ত্ত সরকার গড়ে উঠেছে।

আজ তাই দেখা যাচ্ছে, একটি জাতীয় সত্তা একটি জাতীয় গভর্নমেণ্টের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

এক কথায় বলতে গেলে পাকিস্তান আজ ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেছে। সোজা দুটি টুকরো—যা জোড়া লাগা কোনও মতেই সম্ভব নয়। পাকিস্তানী সরকার ও আর্মির নিদারুণ আক্রমণেই এটা ঘটেছে।

তাই পশ্চিমের এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা কি পরিণামের দিক থেকে ব্যর্থ হয়নি? আজ রাজনৈতিক ফলাফলের বিচার ছাড়া কোনও সরকারী আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে বিচার করা কঠিন।

গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে—পাকিস্তানী বাহিনী কোনও চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারেনি। অবশ্য তারা প্রায় সবগুলি বড় বড় শহরে ঘাঁটি করছে—কিন্তু তার দ্বারাই এই জনগণের সঙ্গে পশ্চিমী সৈন্যদের যুদ্ধের কোন চূড়ান্ত ফল বোঝায় না।

বিরাট বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের বিপক্ষে। সামনে আসছে প্রচণ্ড বর্ষাকাল। তখন সারা পূর্ববাংলা জলের উপরে ভাসমান ছোট ছোট দ্বীপের আকার ধারণ করবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে ছড়ানো পাক সৈন্যের ছাউনিগুলি বিপর্যস্ত হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরবরাহ ব্যবস্থা সব হবে বিপদ ও অসুবিধায় পূর্ণ। নদীনালা, জলজঙ্গল, খালবিল একাকার হয়ে সমুদ্রের আকার ধারণ করবে। গেরিলাবাহিনীর পক্ষে, জনগণের পক্ষে তখন আসবে পাল্টা আক্রমণের ভয়ঙ্কর সুযোগ।

কিন্তু এই পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্যে চাই কেন্দ্রীয় একটি শক্তিশালী সামরিক কম্যাণ্ড। চাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ রেখে গেরিলা আক্রমণের সংগঠন।

প্রধানত শহর অঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রামগুলির গুপ্ত আশ্রয়-কেন্দ্র অবলম্বন করেই পার্টিশান ইউনিটগুলিকে সক্রিয় হতে হবে। গ্রামবাসীদের কর্তব্য হবে গেরিলাদের সাহায্য করা। তাদের

কথা গোপনে রাখা। শত্রুদের সঙ্গে অসহযোগিতা করা ও তাদের গতিবিধির উপরে নজর রাখা। কিন্তু বর্ষার ওপরে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়াও ঠিক নয় কারণ পাক ফৌজরাও তার জন্য নিশ্চয় তৈরী হচ্ছে। তাই গেরিলাদেরও চাই গোপন সংগঠন ও পাল্টা আক্রমণের কৌশল আয়ত্ত করা।

পাকবাহিনী বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তের দিকেও নজর দিয়েছে। তারা এই সব সীমান্তের কাছে মুক্তিফৌজ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য আড়াই হাজার মাইল। তাই পাকবাহিনীর পক্ষে সর্বত্র গার্ড দেওয়া সম্ভব নয়। গেরিলারা তাই নানা গোপন যোগাযোগ গড়ে তুলবে যাতে তারা সাহায্য পায়।

পৃথিবীর প্রায় সব পরাধীন জাতির ঐতিহাসিক সংগ্রামই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অবস্থা ঘোরালো হচ্ছে। রাশিয়া, চীন, আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কোনও না কোনও সিদ্ধান্ত নেবেই। আর এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ ও সৈন্যদের মধ্যেও আসবে অসন্তোষ—অর্থনৈতিক কারণে তা আসতে বাধ্য। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরেই পাকিস্তানী শক্তি শূন্যের দিকে নামবে। তাই তাদের পরাজয় ঘটতে বাধ্য।

একথা মনে রাখতে হবে যে ১৯৫৪ সনে দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধে হোচিমিনের সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল বিরাট শক্তিশালী ফরাসী বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা যেন আমরা ভুলে না যাই। জনসাধারণ যদি বিচ্ছিন্ন না হন, যদি তাঁরা নৈতিক বল অটুট রাখেন, তাহালে স্বাধীন বাংলাদেশের জয় অনিবার্য। একমাত্র ট্যাঙ্ক, মর্টার, বম্বার আর জেনারেলরাই যুদ্ধের শেষ নিয়ামক নন। জনতার সংহতি ও যোদ্ধাদের মনোবলই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে বাধ্য। তার সবচেয়ে বড় কারণ হল এটা মুক্তিযুদ্ধ—এটা ন্যায়ের যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ।

*　　　*　　　*

পরিশেষে একটি বিশেষ খবর জানা গেছে, তা এখানে বলা হচ্ছে। তা হল, বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাক হানাদারদের অত্যাচারের প্রচণ্ডতা দেখে শেখ মুজিবর রহমান স্বেচ্ছায় তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এটি কতকগুলি দৈনিক পত্রিকার বিশেষ খবর। বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি আমৃত্যু অনশন করছেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করেছেন, যাতে তাঁর ওপর কোনও অত্যাচার না করা হয়। অবশ্য এ খবর সঠিক কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

ঋণ স্বীকার

যাঁদের কাছে থেকে এই বই রচনায় প্রচুর সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কাছে জানাচ্ছি আন্তরিক ও অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার।

তাঁরা হলেন :

১। আনন্দবাজার পত্রিকা
২। যুগান্তর পত্রিকা
৩। সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত
৪। „ অমিতাভ গুপ্ত
৫। „ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬। ইত্তেফাক পত্রিকা (ঢাকা)
৭। মর্নিং নিউজ পত্রিকা (ঢাকা)
৮। ডঃ হরপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ, ডি. ফিল্.।